মনিপুরী গ্রন্থমালা—১

ণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি

দনা : হামোম প্রমোদ

দি মণিপুরী

মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা : হামোম প্রমোদ

দি মণিপুরী

(মণিপুরী কালচারাল ডেভেলপমেন্ট, প্রমোশন এন্ড স্টাডি সেন্টার)



আর.কে.সি.এস. এর প্যান্টিং এ মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র এর আমলে অনুষ্ঠিত প্রথম রাসলীলা শ্রীমতি রাধার ভূমিকায় রাজকন্যা এবং মৃদঙ্গ বাদকের নাম ভূমিকায় স্বয়ং রাজা ভাগ্যচন্দ্র।

ঃ সহযোগিতায় ঃ

..কথে.ওয়েল, ফেয়ারট্রাস্ট, ৮৪/১, পূর্বরাজা বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মণিপুরী গ্রন্থমালা-১

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭। সম্পাদনা সহযোগিতা : ওয়াই ললীত প্রচ্ছদ : সৈয়দ লুৎফুল হক। গ্রন্থ স্বত্ব : দি মণিপুরী। কম্পিউটার কম্পোজ : ফাল্গুনী কম্পিউটারস, ৫৩, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা। মুদ্রণ : রিলায়েবল প্রিন্টার্স, ৭৬, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রকাশনায় : **দি মণিপুরী (মণিপুরী** কালচারাল ডেভেলপমেন্ট, প্রমোশন এন্ড স্টাডি সেন্টার) বাড়ী নং ৩৩, রোড নং ৫ এ, সেকশন ৫ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণ : রাস পূর্ণিমা-২০০৬। মুদ্রণ : নাজ এন্টারপ্রাইজ, ৭৭, আরামবাগ, ঢাকা।

মমল ঃ লুপা ১৫০/- (চাম্মা শাঙ্খো)

Monipuri Sahitya O Sangskrity, (Monipuri Literature & Culture) Edited by **Hamom Promud, Published by** : The Manipuri, (Manipuri Cultural Development, Promotion & Study Centre) House # 33, Road # 5A, Section # 5 Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh

উৎসর্গ

মণিপুরী ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির
বিকাশের যাদের শ্রম ও মেধা
নিয়োজিত রয়েছে, বা থাকবে
তাঁদের উদ্দেশ্যে

প্রকাশকের কথা

ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে হাতে হাত রেখে চলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াতে হয়। মনে প্রশ্ন জাগে ওরা কি আমাদেরকে করুণা করছে? নাকি আমাদের নিয়ে ওরা ভুল ধারণা পোষণ করছে? উত্তরটা এরকমই আসে-আমাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করায় করুণা দেখাচ্ছে। এরকম টানাপোড়নের মধ্যে পড়ে অনেক কিছুই করার ইচ্ছে জাগে মূলতঃ যে ইচ্ছেটি প্রবল হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে- আমাদের সম্পর্কিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় ও অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

উপরোক্ত ধারণার বাস্তব প্রতিফলনই হচ্ছে- "দি মণিপুরী"।

মণিপুরী সাহিত্য অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যের মতো সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রেরিত হলেও প্রায় ২০০০ বছর ধরে একটি স্বাধীন এবং নিজস্ব ধারায় চলছে। যদিও এই ভাষায় কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তথাপি মণিপুরী সাহিত্য এমন একটি সাহিত্য, যা যথার্থই 'মৈতৈ সাহিত্য'। মণিপুরী সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ (১) প্রাচীন সাহিত্য, (২) মধ্য-যুগীয় সাহিত্য (৩) আধুনিক সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্যের বিস্তৃতি সুদূর অতীত থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মধ্য-যুগীয় সাহিত্য ১৭০১ খৃঃ থেকে ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত। ১৮৯১ খৃঃ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের যুগ পণ্ডিতদের মতে-নিংথৌরোল তানয়েবা, ঔগ্রী হঙ্গেল, নুমিৎ কাপ্পা, থেঙ্গৌরোল পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লিখিত পুরাণগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভারতের পূর্ব দিগন্তে পাহাড় ঘেরা ও খানিকটা রহস্যে ঢাকা প্রকৃতির কন্যা মণিপুর রাজ্য। প্রাচীন কালে মণিপুর উপত্যকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো খুমন, মোইরাং, অঙোম, নিংথৌজা ইত্যাদি গোত্রের রাজত্ব ছিল। পরবর্তীতে নিংথৌজারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ দখল ও একত্রিকরণের কাজ শুরু করেন। অষ্টম শতাব্দীর দিকে এসে নিংথৌজারা মণিপুর উপত্যকা জুড়ে শাসন শুরু করে। এতে নিংথৌজাদের পরিচয় জ্ঞাপক শব্দ 'মৈতৈ' হয়ে ওঠে একক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর পরিচিতি সূচক নাম। এভাবেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর বর্ণময় সংস্কৃতির সম্মিলনে গড়ে উঠে বর্ণাঢ্য 'মৈতৈ সংস্কৃতি' বা 'মণিপুরী সংস্কৃতি'।

হামোম প্রমোদ, মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধগুলোকে একত্র করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা তাঁর এইকাজকে স্বাগত জানিয়েছি এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থটি যদি পাঠকদের মনে মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু আগ্রহও সৃষ্টি করে তাহলে আমাদের উদ্যোগ সার্থক মনে করবো। এ গ্রন্থটির উন্নতিকল্পে যে কোন পরামর্শ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।

এ দিলীপ মীতৈ
সাধারণ সম্পাদক : **দি মণিপুরী**

দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে কিছু কথা

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে এই সংকলণটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশনার কয়েক বছরের মধ্যেই সবকটি কপি শেষ হয়ে যায়। তাই নতুন সংস্করণ বের করার জন্য অনেক শুভাকাংখির কাছ থেকে অনেকবার তাগিদ আসছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ কিংবা পুন:মুদ্রণ বের করতে পারিনি। কারণ বাংলাদেশের মণিপুরীরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হলেও আর্থিক ভাবে যে খুব একটা সমৃদ্ধ নয়, এটা দু:খজনক হলেও সত্য যে শুধুমাত্র আর্থিক কারণে শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও গ্রন্থটির পুন:মুদ্রণ বের করা সম্ভব হয়নি। তাই একটু দেরী হলেও "কথে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট" এর আর্থিক সহায়তায় বর্ধীত আকারে "মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি" দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো।

"মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি" সংকলণটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণটিও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সবশেষে এই পরিবর্ধীত সংস্করণটি প্রকাশনায় বুদ্ধি, পরামর্শ ও লেখা সরবরাহ করে, অনুলিখন ও সংশোধনের মাধ্যমে এবং আনুষাঙ্গিক অন্য অনেক রকমভাবে সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বিশিষ্ট মণিপুরী সমাজ কর্মী ও লেখক ওয়াই চন্দ্রজীৎ সিংহ এবং মণিপুরী কবি ও লেখক শেরাম নিরঞ্জনকে। এ গ্রন্থ প্রকাশনার আর্থিক অনুদানের জন্য কথে ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সম্মানিত ট্রাষ্টিদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উক্ত গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও অন্যান্য দোষত্রূটির সমস্ত দায়িত্ব আমার একার। তার জন্য আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি আমি।

অক্টোবর ২০০৬
মন্ট্রিয়ল

বিনীত
হামোম প্রমোদ

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
মণিপুরী পুরাণ - সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	১১
মণিপুরী নৃত্যে দুটি ধারা - দেবযানী চলিহা	২১
মণিপুরী প্রবাদ-প্রবচন (পাউরৌ) ও লোক সংগীত - এ. কে. শেরাম	৩৪
মণিপুরী নৃত্য, বাঙালি সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - তামান্না রহমান	৪৫
মণিপুরী লোক সাহিত্য ঃ ফুঙ্গা বারী - এ দিলীপ মীতৈ	৪৯
মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস - হামোম প্রমোদ	৫৪
মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্য - শেরাম নিরঞ্জন	৬০
মণিপুরী গল্প (বাংলা অনুদিত)	
একটি ইলিশ মাছের স্বাদ - নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহ	৬৩
বিষণ্ন আকাশে সন্ধ্যা তাঁরা - শামসুন নাহার (মিতা)	৬৭
পেবেতের গল্প - এলাংবম দীনমনি - অনুবাদ : কঙ্থৌজম সুরজিৎ	৭০
মণিপুরী কবিতা (বাংলা অনুদিত)	
প্রশ্ন - এলাংবম নীলকান্ত	৭৪
বলির পশু - কাঙজম ইবোহল সিংহ	৭৫
আফ্রিকার হৃদয় থেকে - লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ	৭৬
অরণ্য দীপিত হোক - এ. কে. শেরাম	৭৮
বিশ্বপ্রেম - ডাঃ লমাবম কমল	৭৯
মদের নেশায় নয় - রঘু লৈশাংথেম	৮০
বিপ্রতীপ - হামোম প্রমোদ	৮১
মণিপুরের মা - সুবোধ সরকার	৮২
মণিপুরী সাহিত্য পরিষদে - ইশতিয়াক আলম	৮৪
পরিশিষ্ট	৯০

১. সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা
২. অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রাপ্ত মণিপুরী লেখকদের তালিকা
৩. মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্তদের তালিকা
৪. 'সোনামণি মেমোরিয়াল এওয়ার্ড' প্রাপ্তদের তালিকা

ভূমিকা

উৎসের সন্ধানে বাংলাদেশের মণিপুরী

আধুনিক বিশ্বে এমন কোন রাষ্ট্র খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীই বসবাস করে। বাংলাদেশও একটি বহুজাতিক, বহুভাষিক, বৈচিত্রময় সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অধিকারী দেশ। এখানে গরিষ্ঠ বাঙালী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বহু সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠি স্মরণাতীত কাল থেকেই বসবাসরত। প্রতিটি সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা, কৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক কাঠামো আপন উজ্জ্বল মহিমায় পরিপূর্ণ, স্বকীয়তায় ভাস্বর। এরকম একটি সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী মণিপুরী সম্প্রদায়।

বাংলাদেশে মণিপুরীদের বসতি স্থাপনের সময়কাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এটা তর্কাতীতভাবে স্বীকৃত যে আজ থেকে প্রায় আড়াই শতাব্দী আগেই এদেশে মণিপুরী বসতি স্থাপনের সূত্রপাত। বৃহত্তর সিলেট, ঢাকার তেজগাঁও, ময়মনসিংহের সুসং দুর্গাপুর এবং কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে মণিপুরী বসতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কালের বিশাল গহ্বরে একে একে হারিয়ে গেছে এসব বসতি- বর্তমানে শুধু বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মণিপুরীরা। দীর্ঘকাল বসবাসের কারণে বাংলাদেশের মণিপুরীরা আজ চিন্তায় চেতনায় মন-মানসিকতায় পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশী হয়ে গেছে। মণিপুরী একটি জাতিসত্তার নাম। অন্যান্য অনেক জাতির মতো মণিপুরীরাও একটি স্বকীয় ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অধিকারী। মণিপুরীদের আদি উৎসভূমি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর। বাংলাদেশে বসবাসকারী মণিপুরীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ভাষা, কৃষ্টি সব বিষয়ের সঙ্গে ভারতের মণিপুর রাজ্যের মণিপুরীদের সম্পর্ক মৌলিকভাবে একই সূত্রে গাঁথা। পার্থক্য শুধু রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে। তাই মণিপুরীদের শেকড় সন্ধান করতে হলে সঙ্গত কারণেই মণিপুর রাজ্য ও তার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে।

বর্তমান মণিপুর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য একথা আগেই বলেছি। চতুর্দিকে পাহাড় পর্বতে ঘেরা মধ্যিখানে ডিম্বাকৃতি উপত্যকা বিশিষ্ট মনোরম এই স্থানটি সত্যিকার সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। বিশ্বের মানচিত্রে মণিপুরকে যেভাবে পাই তাহলো গোলকের এ্যাটিটিউড (অক্ষাংশ) এর উত্তরে ২৩ থেকে ২৫ এর মধ্যে এবং লন্‌জিটিউড (দ্রাঘিমা) এর পূবে ৯০ থেকে ৯৫ এর মধ্যে। অতীতে মণিপুর সম্পূর্ণ একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৯১ সালে মণিপুর বৃটিশ শাসনে চলে যায়। আবার ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান হলে মণিপুর তার স্বাধীন সত্তা ফিরে যায়। কিন্তু এ স্বাধীনতার সুখ বেশী দিন রইলো না। ১৯৪৯ সালে অনিবার্য এক পরিস্থিতিতে মণিপুর ভারতের শাসনে চলে যায় এবং অদ্যাবধি মণিপুর ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য।

প্রাচীনকালে মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন নাম ছিল কংলৈপাক, কংলৈপুং, কংলৈ, মৈত্রবাক, মেখলী প্রভৃতি এবং মণিপুরীদের পরিচিতি ছিল মৈতৈ-মীতৈ নামে। প্রাচীনকালে মণিপুর

রাজ্যটি প্রতিবেশী বিভিন্ন জনগোষ্ঠির কাছেও বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন- শান রা মণিপুরীদের কা'সে এবং বার্মিজরা কা'থে বলতেন। অন্যদিকে আসামীদের কাছে এ রাজ্যের পরিচিতি ছিল মেখলী নামে। কিন্তু কোন জনগোষ্ঠির কাছেই এই রাজ্যটি মণিপুর নামে পরিচিতি ছিল না। কেউ কেউ বর্তমান মণিপুরকে মহাভারতের মণিপুর বলে দাবী করে থাকেন এবং মণিপুরীরা অর্জুনের বংশধর ক্ষত্রিয় জাত বলে দাবী করেন। কিন্তু ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠ প্রমাণ করে যে, বর্তমান মণিপুর মহাভারত্যেক্ত মণিপুর নয়, এ রাজ্যটির মণিপুর নামকরণ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শান্তদাস গোস্বামী নামক জনৈক হিন্দু ধর্মপ্রচারক কর্তৃক। মৈতৈ রাজ্যকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস হিসাবে তখনকার 'কংলৈপাক' রাজ্যকে মণিপুর বলে অভিহিত করে ঐ রাজ্যের নতুন নামকরণ করেন মণিপুর আর রাজ্যের মূল অধিবাসী মৈতৈদের অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়জাত আর্য্য বলে ঘোষণা দেন। মণিপুরী পুরাণ ও বিভিন্ন প্রাচীন চুক্তিপত্র এবং পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানে আবিষ্কৃত তাম্রফলক,মুদ্রা ও বিভিন্ন শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মণিপুরী বা মৈতৈ কোন জাতি গোষ্ঠি থেকে উদ্ভুত এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিতর্ক আছে। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে প্রাগৈতিহাসিক কালের মনিপুরের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক প্রমাণাদির অভাব থাকার ফলেই বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকরা নিজ নিজ মত ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী রচনা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক ঐতিহাসিক মণিপুরীদের ইতিহাস রচনা কালে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আবার অনেকে মণিপুরীদের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের নিরলস গবেষণার ফলে উদঘাটিত হয়েছে মণিপুরের আদি প্রকৃত ইতিহাস।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মণিপুরের বিভিন্ন এলাকায় খনন কার্য চালিয়ে যে সমস্ত নিদর্শন পেয়েছেন তা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই অঞ্চলে প্রস্তরযুগের মানুষের বসতি ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথরের হাতিয়ার তার সাক্ষ্য দেয়। আসলে মণিপুরের নদী, উপত্যকাগুলিতে অবস্থিত গুহায় এবং পর্বতমালার পাদদেশে আবিষ্কৃত খনন ক্ষেত্রগুলি আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, কেননা মণিপুরের আবহাওয়া ছিল গাছপালা ও জীবজন্তুদের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুকূল আর ওই যুগের মানুষের প্রাণ ধারণের প্রধান উপায়ই ছিল পশু শিকার আর খাওয়ার উপযোগী গাছপালা ও লতাপাতা সংগ্রহ। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মণিপুরের বাসিন্দারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বংশধারা। তাছাড়া চৈনিক সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনও মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ এবং ভাষাতাত্ত্বিকরাও মণিপুরীদের দৈহিক গঠন, পা আর খুলির আকৃতি, চুল ও গায়ের রং, মুখের ভাষা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মণিপুরী বা মৈতৈরা মঙ্গোলীয়

মহাজাতির তিব্বত ব্রহ্ম শাখার কুকিচীন গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ঐতিহাসিকভাবে মণিপুরীরা মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে সর্বসাধারণ্যে স্বীকৃত হলেও মণিপুরী রক্তে মঙ্গোলীয় ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে আর্য ও অন্যান্য রক্তধারা এসে মিশেছে। মনিপুরের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন দল ও জাতিগোষ্ঠি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মনিপুরের উপত্যকায় প্রবেশ করেছে এবং তাদের সম্মিলিত রূপই হলো আজকের মৈতে জাতি যারা সর্বসাধারণ্যে মণিপুরী জাতি বলে পরিচিত।

প্রাগৈতিহাসিক কালে বর্তমান মণিপুর রাজ্য অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল ও তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে অঙোম, খুমন, মইরাং, খাবা ঙানবা, লুওয়াং, চেংলৈ, মঙাং বা নিংথৌজা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন ক্ল্যান বা ট্রাইব মণিপুরে ছোট ছোট অংশে স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল। ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে প্রভূত্ব বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হলে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মঙাং বা নিংথৌজা গোষ্ঠি যা পরবর্তীকালে মীতৈ নামে পরিচিতি পায়, তারাই কালক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করে সমগ্র মণিপুরে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। মণিপুরী বা মৈতৈদের লিখিত ধারাবাহিকত ইতিহাস পাওয়া গেছে ৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে। তখন থেকে সমস্ত ঘটনারাজি "চৈথারোল কুম্বাবা" নামক রাজকীয় ঘটনা পঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে "চৈথারোল কুম্বাবা"ই মণিপুরের অতীত ইতিহাসের একমাত্র সঠিক তথ্য সম্বলিত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র যার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে মণিপুরীদের প্রাচীন ইতিহাস।

মণিপুরের সঙ্গে উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রাচীনকাল থেকেই যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থাদিতে উপমহাদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক পথ হিসাবে মণিপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কখন কিভাবে মণিপুরের আর্যদের আগমন ঘটে তা স্পষ্ট না হলেও এটুকু বলা যায় যে, বিভিন্ন কারণে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আর্যদের মণিপুরে আগমনের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে মণিপুর রাজ পামহৈবা (১৭০৯-১৭৪৮) এর শাসনামলে মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হলে আসাম, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ধর্মপ্রচারক হিসাবে এবং বিভিন্ন কারণে অনেক হিন্দু বাঙালির আগমন ঘটে। শ্রীহট্টের ধর্মপ্রচারক শান্তদাস গোস্বামীর প্রভাবে রাজা পামহৈবা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাবের ফলে মণিপুর রাজ্যের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। রাজা পামহৈবা প্রজাদের মধ্যে মৈতৈদের নিজস্ব ধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং তদনুযায়ী গুরু শান্তদাস গোস্বামীর নির্দেশে মৈতে ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত নথিপত্র বিনষ্ট করা হয় এবং মৈতে দেবদেবীর পূঁজা ও মৈতৈদের নিজস্ব বর্ণমালার প্রচলন নিষিদ্ধ করেন। শুধু তাই নয় শান্তদাস মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এক অভিনব কৌশলের মাধ্যমে এ রাজ্যের নামকরণ করেন মণিপুর আর মৈতৈদের অর্জুনের বংশধর বলে পরিচয় দেন। অন্যাদিকে রাজা পামহৈবা "গরীব নেওয়াজ" বা "দারিদ্রের আশ্রয়" উপাধি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্মকে মণিপুরের জাতীয় ধর্মে পরিণত করেন। কিন্তু মৈতে

প্রজাদের মধ্যে অনেকেই নিজের ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য রাজার আদেশ অমান্য করেন এবং কেউ কেউ রাজ্যের আনাচে কানাচে আত্মগোপন করেন আর অনেকে রাজ্য ছেড়ে পাহাড়-পর্বতে এবং ভিন্ন দেশে পলায়ন করেন। পরবর্তীকালে তারাই মণিপুরীদের নিজস্ব কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন। তবে একথাও ঠিক যে, মণিপুরীরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলেও নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিসর্জন দেয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মণিপুরীদের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিতে।

মণিপুরীরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার ফলে ত্রিপুরা, আসাম, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আর বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে মণিপুরীরা ত্রিপুরা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন শুরু করেন। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই ত্রিবিধকারণে বাংলাদেশে মণিপুরী আগমন ঘটে। কিন্তু মণিপুরীদের বাংলাদেশে আগমন নিয়ে আজও ব্যাপক গবেষণার অভাব থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় কারণে প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের সঙ্গে মণিপুরের যোগাযোগ থাকলেও বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশে মণিপুরীদের আগমন ঘটে। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে বার্মা-মণিপুর যুদ্ধে মণিপুর পরাজিত হলে। বার্মিজদের পৈশাচিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজাসহ মণিপুরীরা দলে দলে দেশ ত্যাগ করে আসাম, ত্রিপুরাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এ দেশের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সহায়তায় বার্মিজদের বিতাড়িত করে এবং মণিপুরীরা আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়। কিন্তু অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করে বাংলাদেশেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ শাসনামলে মণিপুরী রাজাদের ভ্রাতৃকোন্দলের জের হিসাবে কয়েকজন মণিপুরী রাজা ও যুবরাজ বঙ্গদেশে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এর মধ্য থেকে অনেকে স্থায়ীভাবে থেকে যান। এরাই আজকের বাংলাদেশী মণিপুরী যারা স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নিয়ে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশাল প্রেক্ষাপটে এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হয়ে আছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে বর্ণময়।

আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ এবং গবেষক ও নৃতত্ত্ববিদদের কাছে মণিপুরী জাতিগোষ্ঠি সম্পর্কে নব মূল্যায়নের আশা রেখে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি।

অবশেষে অসংখ্য শ্রদ্ধাভাজন হিতৈষী মানুষের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই আমাদের এই প্রকাশনা সম্ভব হলো। তাঁদের সবার প্রতি আমার অপরিমেয় শ্রদ্ধা।

হামোম প্রমোদ

তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক

দি মণিপুরী, ঢাকা।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭

মণিপুর-পুরাণ

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ভারতীয় হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা, এদেশে আগত আর্য্য এবং নানা অনার্য্য জাতির ধর্ম ও সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল। বৈদিক সংস্কৃতি ভাষা এবং হোমাদি অনুষ্ঠান লইয়া ইন্দ্র অগ্নি-মিত্র-বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজক আর্য্যগণ কবে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না- বিভিন্ন পন্ডিত এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু যে মতটি আমার নিকট যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে এই যে, আর্য্যেরা মোসোপোতামিয়া বা আধুনিক ইরাক দেশ হইয়া, পারস্য বা ঈরান ও আফগানিস্তানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০-এর পরে কোনও সময়ে ভারতে প্রবেশ করিতে থাকেন। ভারতে যে সমুদয় অন্-আর্য্য জাতির মানুষের সঙ্গে এই নবাগত আর্য্যদের সংঘর্ষ বা সংগাত ও পরে মিলন ও মিশ্রণ ঘটিল, তাহারা ছিল তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীর অথবা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ-[১] দ্রাবিড় (দাস বা দস্যু ও শুদ্র নামে আর্য্যদের দ্বারা অভিহিত); [২] নিষাদ (নষাদদের উত্তর পুরুষ পরে কোল্ল, ভিল্ল অর্থাৎ কোল ও ভীল নামে পরিচিত হয় ইহাদের বংশধর হইতেছে সাঁওতাল, মুন্ডা, কোররা, হো, বীর-হড়, খাড়িয়া, ভুমিজ, কোর্কু, পদব, শরর এবং ভীল প্রভৃতি মধ্য ও পুর্ব-ভারতের 'আদিবাসী' জাতি); এবং [৩] কিরাত (ইহারা মোঙ্গোল-জাতীয়, ইহাদের নানা ভাষা হইতেছে ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত-নেপালের ও হিমালয়ের সানুদেশের আদিম অধিবাসী নেবার, মগর, গুরুঙ, কনাররী, টীমাল, কিরান্তী, তামাঙ, লেপ্‌চা, আবর, আকা, মিরি, ডফ্‌লা প্রভৃতি, এবং উত্তর-বঙ্গ ও আসমের তথা ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসিগণ বোডো, মিকির, মিশমি, নাগা, কুকি, মেইতেই বা মণিপুরী প্রভৃতি এবং আসামে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে আগত অহমগণ- ইহারা হইতেছে কিরাত-জাতীয় মানুষ। নিষাদ গণ বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী ইতিহাস-পূর্ব যুগ হইতে ইহারা এদেশে বাস করিতছে, ইহাদের ই সত্যকার 'আদিবাসী' বলা যায়। নিষাদগণের পরে পশ্চিম এশিয়া হইতে দ্রাবিড়দের আগমন হয় খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০০ এর পূর্বেই পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিরাট নাগরিক সভ্যতা (যাহার ধ্বংসাবশেষ এখন আমাদের বিস্মিত করিতেছে) খুব সম্ভব ই দ্রাবিড়-ভাষী মানুষের সৃষ্টি। নিষাদগণ ও দ্রাবিড়গন প্রায় সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে কিরাতদের উপস্থিতির কথা আমরা যজুর্বেদও অথর্ববেদ হইতে জানিতে পারি; অন্ততঃ খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ বৎসরের পূর্ব হইতে কিরাতগণ আসাম ও হিমালয়ের সানুদেশ ধরিয়া নেপালে, উত্তর বিহারে, উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে এবং আসামে উপনিবিষ্ট হইতে থাকে।

প্রভুশক্তিসমন্বিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুধীর এবং কল্পনাশীল আর্য্যগণ উত্তর ভারতে দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতগণের সংসম্পর্শে আসিল, তাহাদের বিজেতা-রূপে। প্রথমটায় বিভিন্ন জাতির মানুষ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে, যাহার আভাস আমরা ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে পাই। পরে

আর্য্যগণ এদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে, দেশের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের ভাষা গ্রহণ করিতে থাকে দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং কিরাত গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষার মধ্যে ইপ্সিত ও আবশ্যক গেযাসুত্ররূপে আর্য্যভাষার বিশেস উপযোগিতা বা কার্য্যকারিতা ছিল বলিয়া, আর্য্যভাষা সহজেই প্রসার লাভ করিতে থাকে। এক-ই আর্য্যভাষা লইয়া যখন আর্য্য, দ্রাবিড় ও নিষাদ এবং উত্তরে হিমালয়-অঞ্চলে ও পূর্বে উত্তর -বিহারে ও উত্তর-বঙ্গে এবং পূর্ব-বঙ্গে ও আসামে একটি সমভাষিক জনগণ বা রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছিল, তখন হইতে জন-সমাজের অলক্ষ্যে ইহাদের ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত মিলন ঘটিতে থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন লোক কিছু কিছু ছিল যাহারা অন্য জাতির ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত মিশ্রণ চাহিত না। কিন্তু আর্য্যভাষী ব্রাহ্মণাদি চিন্তানেতাদের মনীষা, তাহাদের উদারতা ও দুরদৃষ্টি, এই সাংস্কৃতিক মিলনকে একটি পরিপূর্ণ নবীন সংস্কৃতির গঠনের পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। অনার্য্য দ্রাবিড়, নিষাদ ও কিরাতের প্রাচীন দেব-বাদ ও পুরাণ-কথা আর্য্য দেব-বাদ ও পুরাণ-কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত হইয়া ও সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত হইয়া, হিন্দু পুরান-কথায় পরিণত হয়।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু ধর্মে এই দুই ধারার সম্বন্ধে পন্ডিতগণ সচেতন ছিলেন। তাহারা হিন্দু শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানকে দুইটি মুখ্য ভাগে ভাগ করেন বৈদিক শাস্ত্র বা "নগম" এবং বেদেতর বা অবৈদিক শাস্ত্র বা "আগম", বেদান্ত শাস্ত্রও "নিগমান্ত" বিদ্যা নামে পরিচিত। হিন্দু মহাজাতির অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহাদের নিজস্ব দেবতাদেরও প্রাচীন রাজাদের কাহিনী-এক কথায়, তাহাদের পুরাণ-কথা-নূতন মিলিত আর্য্যানার্য্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আসিয়া, কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়া, সংস্কৃত ভাষায় নব কলেবর প্রাপ্ত হয়, ও তদন্তর নিখিল ভারতের গ্রহণযোগ্য হয়। এই ভাবে বিশাল অরণ্যানীবৎ হিন্দু-জগতের পুরাণ-কথা সংস্কৃত রামায়ণে, মহাভারতে ও অষ্টাদশ মহাপুরাণে ও উপপুরাণে, দ্রাবিড় দেশের নানা স্থল-পুরাণে, "স্বয়ম্ভূ-পুরাণ" প্রভৃতি নেপালের বৌদ্ধপুরাণে, এবং প্রাকৃতে ও আধুনিক আর্য্য ভাষায় নিবদ্ধ, তথা বিভিন্ন অনার্য্য ভাষায় মৌখিক কাহিনীরূপে প্রচারিত, সমগ্র ভারতের পুরাণ-কথা গড়িয়া উঠিয়াছে-যাহার একটা বড়ো অংশ প্রাচীন কালেই (অর্থাৎ এদেশে তুর্কীদের আগমনের পূর্বে) এবং কিছু পরেও সংস্কৃত পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, বহু স্থলে একটি সমগ্র অনার্য্য-ভাষী জাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া দুই-তিন পুরুষের মধ্যে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে আমাদের চোখের সামনে বহু দ্রাবিড়-গোন্ড জাতির লোক, কোল জাতির লোক এবং নেপালে ও অন্যত্র কিরাত-জাতির লোক হিন্দু সমাজের অঙ্গীভুত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাদের ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মানুভূতি এবং পুরাণ-কথা যথারীতি সংস্কৃতে বিধৃত হইয়া, বৃহত্তর হিন্দু-পুরাণের অংশ হইয়া দাঁড়াইয়্ছে; বহুশঃ সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হওয়ার ফলে, এই প্রকাশ অনুভূতি, অনুষ্ঠানও পুরাণ নিখিল-ভারতের দ্বারাও গৃহীত হইয়াছে।

বহুস্থলে আবার দেখা যায়, এইরূপ অনার্য্য পুরাণ আর্য্যানার্য্য বা হিন্দু পুরাণের প্রভাবে আসিয়া গেলেও, তাহার নিজের একটি সংস্কৃতেতর আদিম-গন্ধী রূপও অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। মধ্যভারতের বিভিন্ন দ্রাবিড় ও কোল-ভাষী জাতির মধ্যে এবং এখন আর্য্যভাষী হইলেও যাহার মূলতঃ দ্রাবিড় ও কোল-ভাষা বলিত এমন (হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে গৃহীত) নানা জাতির মধ্যে, যে সকল পুরান কথা প্রচলিত আছে, সেগুলি সংগ্রহ ও বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ Verrier Elwin [ভেরিয়ার এলউইন] এ বিষয়ে লক্ষণীয় কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) আমি মণিপুরে যাই-কেবল দুই দিনের "ঝাঁকী দর্শণ" এবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কিছু বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, মণিপুরের ইতিহাস ও folklore অর্থাৎ লোকযান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নও করিয়াছি এবং স্থানীয় দুই-চারজন সুধী ও পন্ডিতের সঙ্গে আলাপও করিয়াছি। মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। যতদুর জানা যায়, খ্রীষ্টিয় ১৫০০-র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্ম প্রসার লাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদি কালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরী হিন্দু ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন; ইহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্গত কুকি। (বা চিন, অথবা কুকি চিন) প্রশাখার একটি বিশিষ্ট উপজাতি। সৌন্দর্য্য-বোধ এবং কর্মকুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতার ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেব-কথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মান-জ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরান কথাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাত সারে আর্য্যানার্য্য সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মণিপুরের প্রচলিত হিন্দু ধর্মে এক দিকে যেমন রামায়ন, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতির সম্মানপূর্ণ স্থান আছে, অন্য দিকে তেমনি বিশিষ্ট মণিপুরী দেব-কাহিনী ও হিন্দু-পূর্ব যুগের নানা রীতি-নীতি অনুষ্ঠান পদ্ধতি ইহাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অনেকটা জুড়িয়া আছে। মণিপুরের চিন্তাশীল নেতৃবর্গের আকাংখা হইতেছে, এই উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা এবং মণিপুরের জীবনে হিন্দু দর্শন ও উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ কথাগুলিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তোলা। মণিপুরকে নিখিল-ভারতের অংশ রূপেই ইহারা দেখেন। মণিপুরে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরান প্রচারে যিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, "মণিপুরী পুরাণ" ও সংস্কৃত পুরাণকে একত্র গ্রথিত করিয়া দিতে যিনি নিজ পান্ডিত্যের পূর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং যিনি মণিপুরী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের সেবার জন্য নিখিল

ভারতের সাধুবাদ পাইয়াছেন, মণিপুরের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আতোম্‌বাপু শর্মা সাহিত্যরত্ন পন্ডিতরাজের নাম এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরের দেব-কথা ও মণিপুরের ইতিহাস, কি ভাবে হিন্দু ভারতীয় দেব-কথা ও ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিভাবে মণিপুরের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের টানার উপরে ভারতীয় মিশ্র আর্য্যানার্য্য হিন্দুদের দেব-কথা ও ঐতিহ্যের পড়িয়ান আনিয়া, মণিপুরী হিন্দুত্বের অভিনব ধূপছায়া বস্ত্র বয়ন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই ভাবে, মিশ্র মণিপুরী (মেইতেই বা কুকি-চিন) ও হিন্দু-শাস্ত্রীয় পুরাণ-কাহিনীকে আমরা "মণিপুর-পুরাণ" আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য এই পুরাণ কথা সংস্কৃত ভাষায় অথবা বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ হয় নাই আংশিকভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইংরেজীতে ইহা আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও মণিপুরীতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আসামের শান-গোষ্ঠীর অহম বা অসম জাতির পুরা-কথা লইয়া তেমনি একখানি অলিখিত "অসম-পুরাণ"-ও আছে। বাঙ্গালার ভগিনী, আর্য্য অসমীয়া ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত-সার পাওয়া যায়। অনুরুপ অলিখিত "ত্রিপুর-পুরাণ" সম্ভবত ত্রিপুরা বা টিপ্‌রা জাতির প্রাচীন ধর্মের পুরোহিতগণের মধ্যে (চন্তাই-গণের মধ্যে) অনুসন্ধান করিলে মিলিবে; এবং কাছাড়ীদের 'হিড়িম্বা' বা "হেরম্ব-পুরাণ" এবং খাসিয়া ও জৈন্তিয়াদিগের "জয়ন্তী-পুরাণ"-ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া আছে।

নিম্নে এই "মণিপুর-পুরাণ" এর কতকগুলি লক্ষণীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

মণিপুরীদের প্রাচীন দেবতারা হিন্দুশোস্ত্রোক্ত দেবতাদের সহিত অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন। "মৈ" হইতেছেন ব্রহ্মা, "ইশিঙ" হইতেছেন বিষ্ণু, ও "নুঙ শিং" শিব; তেমনি "শোরারেল্" বা "শোরারেন্" হইতেছেন ইন্দ্র "মার্‌জিঙ্" কুবের, "খোরিফাবা" বরুণ, "বাঙ্‌ব্রেল্" যম, "ইরুম্" অগ্নি, এবং "তাওরোইনাই" হইতেছেন নাগ-রাজ অনন্ত।

শিব ও পার্বতী বিশেষ করিয়া মণিপুরে অবস্থানের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা প্রথমে মণিপুরে "নোঙ্‌মাইজিঙ্" বা নীলকণ্ঠ-গিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কতকগুলি পর্বত বাসের জন্য তাহাদের মনঃপূত হইল। এই পর্বতগুলি এখন মণিপুরে বিভিন্ন তীর্থ-রূপে পরিচিত, এইসব স্থানে সহস্র-সহস্র যাত্রীর সমাগত হইয়া থাকে। মণিপুরে শিব নূতন করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার একটি নতুন নাম হইল "পোইরেইতোন্" অর্থাৎ 'যিনি নূতন স্থানে আসিয়াছেন'।

শিব মণিপুরে আসিয়া সপ্তশীর্ষ "সানাজিঙ্" বা স্বর্গভূমি হইতে সাত জন দেবতার আবির্ভাব ঘটাইলেন। ইঁহারা সাতটি গ্রহের রূপে বিদ্যমান আছেন-

(১) "নোঙ্‌মাইজিঙ্" বা সূর্য্য, (২) "নিঙ্‌থোউকাবা" অর্থাৎ চন্দ্র, (৩) "লেইপাক্‌পোক্‌প" অর্থাৎ মঙ্গল, (৪) "যুম-সাইকে-সা" অর্থাৎ বুধ, (৫) "সাগোলসেল্" অর্থাৎ বৃহস্পতি, (৬) "ইরাই" অর্থাৎ শুক্র, ও (৭) "থাঙ্‌জা" অর্থাৎ শনি। ইঁহাদের মধ্যে মঙ্গলের মহিষমুন্ড, বুধের গজমুন্ড, বৃহস্পতির হরিণমুন্ড ও শুক্রের ব্যাঘ্রমুন্ড।

শিব ও পার্বতী তৎপরে মণিপুর রাজ্যের ঈশান-কোণে (উত্তর-পশ্চিমে) অবস্থিত "কোউ-ব্রু" বা কুমার পর্বতে গিয়া অবস্থান করিলেন। মণিপুরে ইঁহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহারা এখানে আসিয়া রাস-নৃত্য করিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাস-নৃত্য করিতেছেন, তখন গোপেশ্বর শিব ও দেবী রাস-মন্ডপের বাহিরে দ্বারে দ্বারপালের কার্য্যে নিযুক্ত। ভিতরে রাস-নৃত্যের বাদ্য ও ধ্বনি শুনিয়া দেবীর আকাঙ্ক্ষা হইল যে, তিনিও রাস-দর্শন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শিব ও উমাকে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থানে গিয়া নিজেরা যাহাতে রাস-নৃত্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে নির্দেশ করিলেন। মহারাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে ইহারা মণিপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন; এবং "কোউ-ব্রু" পাহাড় রাসের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া, শিব ও উমা বিশেষ প্রীত হইলেন। কিন্তু দেশটি নানা নদীর জন্য জলময় ছিল। যাহাতে দেশটি শুষ্ক হইয়া যায়, তজ্জন্য শিব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন আগমন করিলেন; একটি বিশেষ অঞ্চল জনশূন্য হওয়ায় উহা "বিষ্ণুপুর" নামে পরিচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সঙ্গে দশ জন দেবতা আসিলেন-"হাওবা শোরারেল" বা ইন্দ্র, "মার্জিঙ্" বা কুবের, "বাঙব্রেল্" বা যম, "খোরিফাবা" বা বরুন, "ইরুম নিঙখৌ" বা অগ্নি, "থাঙ্জিঙ্" বা অশ্বিনীকুমার অথবা নির্ঋতি, "চিঙ্খেই-নিঙ্থোই" বা ঈমান "লোইয়া-লাকপা" বা বায়ু এবং "নোঙ্সোবা" ও "কোঙবা-মেইরোম্বা"। ইঁহাদের চেষ্টায় সমস্ত দেশটি আর্দ্রতা হইতে মুক্ত হইল, এবং এই দশজন দেবতার প্রথম আটজন অষ্ট দিক্পাল হইলেন, কেবল "নোঙ্সাবা" ও "কোঙ্বা-মেইরোম্ব" ইন্দ্রের সহিত পূর্বের অধিষ্ঠাতা হইয়া রহিলেন। মণিপুরে শিব ও পার্বতী আসিয়া পর্বতের অধিবাসী রূপে কেবল কিরাত-জাতীয় লোকেদের দেখা পান।

দেশটি পরিষ্কৃত ও সুসংস্কৃত হইলে পরে, শিব ও উমার রাস-নৃত্যের আয়োজন হইল। জগৎপিতা ও জগন্মাতার মহারাস উপলক্ষ্যে দেবতারা নানা বাদ্য-যন্ত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্ত-নাগ নিজের মাথার মণির দ্বারা সাত দিন সাত রাত ধরিয়া, মহারাসের অবসান পর্য্যন্ত, সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়া রাখিলেন; সেইজন্য দেশটির নাম হইল "মণিপুর"। মণিপুর এইভাবে সৃষ্টির উষঃকালে হর-পার্বতী রাস-নৃত্যে দ্বারা পবিত্র হইল; দেবতারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং মণিপুরের ভূমিকে আশীর্বাদ করিলেন-চিরকাল এই দেশ হরিদ্বর্ণ থাকিবে, এবং পরমেশ্বরের প্রতি দেশবাসীর অচলা ভক্তি থাকিবে। পূর্বে শিবের নাম অনুসারে দেশের নাম হইয়াছিল "শিব নগর", মহারাসের পর হইতে ইহা "মণিপুর" নামই প্রসিদ্ধ হইল।

দেবতারা শিবকেই দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু শিব অনন্ত-নাগকে দেশের রাজা করিলেন। বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে মণিপুরের ভূমিতে এক স্থানে একটি সুরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে একটি পাহাড়ের উপরে অনন্ত-নাগের রাজপাট ও সিংহাসন স্থাপিত হইল। কার্ত্তিকের ও গণেশের মূর্তি রাজবাটীর সিংহদ্বারের দুই পাশে স্থাপিত হইল। রাজবাটী স্থাপনের পরে, সময় নির্দেশের জন্য একটি তালমান যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। অনন্ত-নাগ দেবতাদের প্রীতির জন্য নৌকা লইয়া বাইচ-খেলার প্রবর্তন করিলেন।

এই বাইচ-খেলায় দেবতা ও অপ্সরাগণ যোগ দিয়া আমোদ পাইলেন। দোড়ি টানিয়া শক্তি-পরীক্ষা খেলার পরিবর্তে, লম্বা দন্ড লইয়া টানাটানি খেলারও প্রর্বতন হইল। "মার্‌জিঙ্" বা কুবের-দেব "কাঙ্‌জেই" অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া পোলো খেলা আবিষ্কার করিলেন; দেবতার সাতজন সাতজন করিয়া দুইটি প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম এইরূপ ক্রীড়া করিরেন। এইপোলো-খেলার দ্বারা দেবতারা প্রীত হন; সেইজন্য দেশের কোনও মহামারী দেখা দিলে মণিপুরীরা দেবতাদের নামে পোলো খেলার লাঠি ও গোলা উৎসর্গ করিয়া থাকে।

এই ভাবে মণিপুরের প্রথম রাজা হইলেন অনন্ত-নাগ। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া তিনি মণিপুর হইতে তাহার নিজ রাজ্য পাতালে ফিরিয়া গেলেন। অনন্ত-নাগ মণিপুরের প্রথম রাজা ছিলেন বলিয়া, মণিপুরের রাজাদের বিশেষ লাঞ্ছন হইতেছে, মুকুট মাথায় জটিল গ্রন্থির আকারে বিন্যস্ত নাগ-মুর্তি; এই মুর্তির চিত্র তাহাদের রাজকীয় পতাকায় অঙ্কিত থাকে।

অন্তন-নাগের পরে মণিপুরের রাজা হন চিত্রভানু নামে গন্ধর্ব। কি ভাবে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল, সে সম্বন্ধে মণিপুরের প্রাচীন পুরাণ-কথায় কিছু-ই উল্লিখিত নাই।

মণিপুরের প্রথম মানুষের সৃষ্টি কি করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানটি হিন্দু পূর্ব বা আর্য্যপুর্ব যুগের মেইতেই বা মণিপুরী সৃষ্টি-কথা বলিতে পারা যায়। মণিপুরী ভাষার পুরান (লৈথাক লৈখারোল্) অনুসারে শিব এই সৃষ্টি কথা প্রথমে গণেশকে শুনান। এই সৃষ্টি-কথা হইতেছে এই প্রকার।

পরমেশ্বর "আতিয়া-গুরু-শি-দবা", স্বর্গে যাঁহার বাস (আতিয়া অর্থে আকাশ বা স্বর্গ, গুরু সংস্কৃত শব্দ, শি-দবা অর্থে অমর) তিনি মানব সৃজন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্বীয় দেহ হইতে "কোদিন" নামে এক দেবতার সৃষ্টি করিলেন। কোদিন্‌কে আজ্ঞা দেওয়া হইল, এমন একটি প্রাণী সৃজন করিতে, যে জন্ম হওয়ার কারণেই মৃত্যুর অধীন হইবে। কোদিন তখন সাতটি ভেক ও সাতটি বানর সৃজন করিয়া, শি-দবা গুরুর সমক্ষে স্থাপিত করিলেন। শি-দবা গুরু কিন্তু ইহাতে খুশী হইলেন না; এই জীবগুলির জ্ঞানবিচার এবং অনুভব শক্তি ছিল না। তিনি কোদিন্‌কে বলিলেন—"দেখ, আমি এই দাঁড়াইয়া আছি; আমার রূপ বা ছায়া ধরিয়া কোনও প্রাণী সৃজন কর।" কোদিন্ তখন তদনুসারে নূতন একটি রূপ বা আকার গঠন করিলেন, কিন্তু তাহাতে প্রাণ-শক্তি দেওয়া কোদিন্-এর সাধ্যের বাহিরে ছিল। তখন শি-দবা গুরু তাহাতে প্রাণ বায়ূ সঞ্চারিত করিলেন, এবং এইভাবে মানুষের উদ্ভব হইল। ভেক সাতটিকে তিনি জলে ছাড়িয়া দিলেন, ও বানর সাতটিকে পাহাড়ে পাঠাইলেন; মানুষ আসিয়া উপত্যকায় বাস করিতে লাগিল।

ইহার পরে আতিয়া-গুরু-শি-দবা মানবের রূপে সূর্য্য ("নুমিৎ") ও চন্দ্র ("থা") সৃজন করিলেন; সূর্য্যের নাম হইল "কোজিন্-তু থোক্‌পা" ও চন্দ্রের "আশিবা"। ইহার পরে গুরু শি-দবা পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইলেন।

আতিয়া গুরু শিদবা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে একটি সুরঙ্গ-পথ দিয়ে প্রথম প্রকট হন। এই সুরঙ্গ-পথ বা গহ্বর বরাহ-রূপী বিষ্ণুর নিশ্বাসে প্রস্তুত হইয়াছিল। শি-দবা গুরুর

সঙ্গেসাতজন অপ্সরা বা দেবীও পৃথিবীতে আসেন। এই সাতজন দেবী (মণিপুরী ভাষায় ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম আছে) সাত গ্রহ-দেবতার সহিত বিবাহিত হন; -----এই সাত দেব-দম্পতীর প্রত্যেকের একটি করিয়া পুত্র হয়। সেই পুত্রেরা মণিপুরী জাতির সাতটি "শালাই" অর্থাৎ উপজাতির অথবা গোত্রের পূর্বপুরুষ। আর্য্য বা হিন্দু গোত্রের সহিত এই সাতটি গোত্রের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যথা- (১) 'অঙোম্'= ভারদ্বাজ, মতান্তরে কৌশিক; (২) 'নিঙ্থৌজা' = শাণ্ডিল্য; (৩) 'লুরাঙ্'=কাশ্যপ; (৪) "খুমোল্" বা "খুমোন্"= মৌদ্গল্য (এই গোত্র নাম কচিৎ "মধুকুল্য" রূপেও বিকৃত হইয়াছে); (৫) "খাবা-ঙাঙ্বা"=নৈমিষ্য, মতান্তরে ভারদ্বাজ; (৬) "মোইরাঙ্"= আত্রেয়; এবং (৭) "চেঙ্লোই"=ভারদ্বাজ। গুরু শি-দবা পরমেশ্বরের দ্বারা সাতটি গোত্রের আদি পুরুষ নির্ধারণের কথা, হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার সাত মানসপুত্র সপ্তর্ষি হইতে নানা ঋষি বা আর্য্য গোত্রের উদ্ভবের কথার অনুরূপ। মণিপুরীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আবার এই সপ্ত "শলাই" বা গোত্রের আদি পুরুষগণের উদ্ভব হয় গুরু শি-দবার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে-সপ্ত-গ্রহদেবের সহিত সপ্তদেবী ও অপ্সরাগণের বিবাহের ফলে নহে। আমাদের প্রাচীন বিশ্বাস মত, যেমন ব্রহ্মার বা ঋগ্বেদোক্ত "পুরুষ" এর মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উদ্ভব হয়, তেমনি গুরু শি-দবার দক্ষিণ চক্ষু ও বাম চক্ষু, দক্ষিণ কর্ণ বা বাম কর্ণ, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র ও বাম নাসারন্ধ্র এবং দন্ত হইতে এই সাত "শলাই" এর আদি পুরুষগণ আবির্ভূত হন।

মণিপুরী পুরাণ "লৈথাক্-লৈখারোল্" গ্রন্থে অন্যত্র মণিপুরের আদিম দেবতাদের সম্বন্ধে আরও কতকগুলী উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি হইতেছে "পাখাঙ্বা" (বা "সেনত্রেঙ্") ও "শেনামাহি" (বা "কুপত্রেঙ") দেবতাদ্বয়ের উপাখ্যান, ইঁহারা পরমেশ্বর গুরু শি-দবার পুত্র। ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইঁহারা পিতার অনুমতি লইয়া মণিপুরে আসিলেন। পিতার প্রতি ইঁহাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে, গুরু শি-দবা মৃত গাভীর আকার ধারণ করিয়া বিজয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। সেনত্রেঙ্ দেব অনুমানে বুঝিলেন যে এই মৃত গাভী আর কেহ-ই নহে, গুরু শি-দবা। দুই ভাইয়ে তখন মৃত গাভীর কেহ-ই নহে, গুরু শি-দবা। দুই ভাইয়ে তখন মৃত গাভীর দেহ টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলেন। গুরু শিদবা গাভীর দেহ হইতে বাহির হইয়া স্বরূপে দেখা দিলেন ও পুত্রদের বলিলেন যে, তিনি তাহাদের পিতার প্রতি শ্রদ্ধা দর্শনে তুষ্ট হইয়াছেন-সেন্ত্রেঙ্ কে তিনি নূতন নাম দিলেন "পাখাঙ্বা" অর্থাৎ যে পিতাকে চিনে ("পা"=পিতা, "খাঙ্ বা"=চেনা, জানা)। দুই ভাই মৃত গাভীর শরীর কাটিয়া, সাত "শলাই" বা গোত্র পতির মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। একজন পাইলেন চোখ দুইটি ও অধোদেহের কিছু অংশ, একজন মাথার খুলি, একজন হৃৎপিন্ড, একজন চারিটি পা, ইত্যাদি। গোরুর চামড়া একস্থানে শুকানো হইল, সেই স্থানের নাম "কাঙ্লা" ("কাঙ্বা= শুখানো হইতে)। সাত গোত্রপতি তখন মৃত গাভীর দেহের অংশ লইয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রাচীন কুকি উপাখ্যানে এই যজ্ঞের কথার অবতারণা করিয়া, ইহাতে হিন্দু বৈদিক ধর্মের হাওয়া একটু বহানো হইয়াছে।

গুরু শি-দবা বলিলেন, দুই ভাইদের মধ্যে যে প্রথম সারা জগৎ ঘুরিয়া আসিতে পারিবে, তাহাকেই তিনি রাজা করিয়া দিবেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে "কুপ্‌ত্রেঙ্" (বা "শেনামাহি") জগৎ-পরিক্রমা করিবার জন্য "কাঙ্লা" হইতে বিনির্গত হইলেন, কিন্তু "লেইমারেন্-শি-দাবি" নামে দেবতার পরামর্শে 'সেন্‌ত্রেঙ্" (বা "পাখাঙবা") পিতার সিঙহাসনের চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলেন। গুরু শি-দবা ইহাতে প্রীত হইলেন এবং সেই প্রদক্ষিণকেই তিন জগৎ পরিক্রমার অনুরূপ স্থির করিয়া, পাখাঙবা-কে রাজা করিয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বজগৎ ঘুরিয়া আসিযা কুপত্রেঙ দেখিলেন যে, ভাই রাজা হইয়া বসিয়াছেন। (মাতা পার্বতীকে পরিক্রমন করাই জগৎ পরিক্রমার তুল্য এইরূপ একটি উপাখ্যান আমাদের মধ্যেও আছে গনেশ এই ভাবে কার্ত্তিককে বোকা বানান।) ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কুপ্‌ত্রেঙ্ পাখাঙবার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। পাখাঙবা ভয় পাইয়া অপ্সরা বা দেবকন্যাদের আশ্রয় লইলেন। দেবকন্যারা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, ও "আউগ্রিহাঙেল্" নৃত্যানুষ্ঠানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। কুপ্‌ত্রেঙ বা শেনামাহি তখন পাখাঙবার বিনাশের জন্য ভূমির উপরে নিজের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলেন। ইহাতে পাতাল হইতে গুরু শিদবা বাহির হইয়া আসিলেন। পাতালের অনন্ত-নাগ ("তাওরোই-নাই") ছিলেন তাঁহার বাহন। গুরু শি-দবা দুই ভাইযের বিরোধ শান্ত করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, পর-পর এক-এক বছর করিয়া দুইজন রাজত্ব করিবেন। যিনি রাজত্ব হইতে বিরত থাকিবেন, তিনি মণিপুরের প্রত্যেক ঘর হইতে লেইমারেন-শিদাবি দেবতার সঙ্গে মিলিত-ভাবে রাজার যোগ্য পূজা পাইবেন। ইহার পরে গুরু শি-দবা অন্তর্হিত হইলেন, লেইমারেন শি-দাবি দুই ভাইকে বুঝাইয়া দিলেন যে, গুরু শি-দবা হইতেছেন পরমাত্মা পরমেশ্বর। তখন ভগবান শিবও পঞ্চানন রূপে দেখা দিলেন; এবং সুর্য্যদেব জ্বলন্ত অগ্নি রূপে অতি উজ্জ্বল মুর্ত্তিতে প্রকট হইলেন।

পূর্বে বর্ণিত অনন্ত-নাগ ও দুই ভাই দেবতা পাখাঙ্‌বা ও শেনামাহির রাজত্বের পরে, গন্ধর্ব চিত্রভানু মণিপুরের রাজা হন। মণিপুরের আদি পুরাণের সঙ্গে হিন্দু পুরাণের ও মহাভারতের সামঞ্জস্য করিয়া, অভিনব মণিপুর-পুরাণ গ্রথিত হয়। নারায়ণের নাভিকমল-জাত ব্রহ্মার দেহ হইতে উৎপন্ন মরীচি মুনি, তৎপুত্র চিত্রবীজ, তৎপুত্র চিত্রসর্ব, তৎপুত্র চিত্ররাজ, তৎপুত্র চিত্রভানু। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভানু পর্য্যন্ত সকলেইগন্ধর্ব ছিলেন। অপুত্রক চিত্র ভানুর একমাত্র কন্যা চিত্রাঙ্গদা তৃতীয় পান্ডব মহাভারতের নায়ক অর্জুনের পত্নী হন; চিত্রাঙ্গদার ও অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন, বভ্রুবাহনের পুত্র সুপ্রবাহু, তৎপুত্র যবিষ্ঠ।

অর্জুনের আগমন সম্পর্কে মণিপুরের কতকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য পুরান কথার সহিত এখানে মণিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলন ঘটানো হইয়াছে। মণিপুরের ইতিকথায়, ব্রাহ্মণ ও মণিপুরী পুরাণ মিলাইয়া প্রাচীন রাজাদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিন্তু ঐতিহাসিক স্থিরতা নাই। একটি মত অনুসারে, বভ্রুবাহনের পৌত্র যবিষ্ঠ, অন্যতম অনুসারে বভ্রবাহনের পরে তেরো জন রাজা, তৎপরে যবিষ্ঠ। এই তেরো জনের মধ্যে প্রথম দুইজনের মাত্র সংস্কৃত নাম, তাহার মধ্যে একটি অতি আধুনিক ছাঁদের

"কলাপচন্দ্র" অন্যটি "শক্তি" বাকী ১১টি মণিপুরী ভাষায়। যবিষ্ঠের মণিপুরী নাম হইতেছে "পাখাঙ্‌বা"; উপরে বর্ণিত গুরু শি-দবার পুত্র দেবতা ওরাজা পাখাঙবার নাম অনুসারে ইহার এই মণিপুরী নাম হয়। সম্ভবতঃ মণিপুরী ঐতিহ্যের নামী রাজা পাখাঙবার সহিত, গন্ধর্বরাজ কুমারী ও পান্ডব অর্জুনের উত্তর-পুরুষ রাজা যবিষ্ঠকে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাখাঙবার সম্বন্ধে কতকগুলি লোকপ্রিয় উপাখ্যান আছে। মণিপুরী তারিখ গণনার মতে, পাখাঙ্‌বা হইতেছেন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মানুষ-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নাকি তিনি মারা যান। রাজা 'ইঙেউ-পানবা" ইহার পিতা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপারে উল্লেখ আছে। জন্মকালে ইঁহার নাম দেওয়া হয় "মেইদিঙ্গু", পরে নাম দেওয়া হয় "পাখাঙ্‌বা"। পাখাঙ্‌বার রাজত্ব নানা কারণে মণিপুরীদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সময়ে মণিপুরী গোত্র এবং গোত্র-জাত বিভিন্ন বংশ বা পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, সামাজিক নানা নিয়ম বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত করা হয় (যেগুলি মণিপুরীদের সমাজে এখনও কার্য্যকর হইয়া আছে)। পাতরা কাঁসার খন্ডের এক প্রকার মুদ্রা ইঁহার সময়ে প্রচলিত হয়; এই মুদ্রার নাম "শেল"। "চেইথারোল কুম্বাবা" নামে বর্ষপঞ্জী লিখিবার রীতি ইঁহার-ই রাজত্বকালে প্রবর্তিত হয় বলিয়া কথিত। "মাকেঙ্" গোত্রের জনৈক সরদারের কন্যা "লাই-স্রা"-র প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে ইনি বিবাহ করেন-পাখাঙ্‌বা ও লাইস্রাকে লইয়া মণিপুরের পুরানে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে।

পাখাঙ্‌বার পর হইতে মণিপুরের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রথম কতকগুলি রাজার সুদীর্ঘ রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই ইতিহাস পুনর্গঠিত হইবার কালে কতকগুলি নাম পাওয়া যায় নাই। এই রাজাদের রাজত্ব কালে প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের সকলেরই দুইটি করিয়া নাম মিলে একটি সংস্কৃত, অন্যটি মণিপুরী। যেমন "কোইবা তোম্বা" বা ক্ষেমচন্দ্র, "কোম্ব্যোউবা" বা কবিচন্দ্র সিংহ, "অয়াংবা" বা অখন্ড-প্রতাপ সিংহ। খ্রীষ্টীয় ১১২৭ থেকে ১১৫৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন "লোয়াম্বা" বা লবঙ্গ সিংহ; ইহার-ই রাজত্বকালে মণিপুরের বিখ্যাত প্রেমমূলক উপাখ্যানের নায়ক "খাম্বা" ও নায়িকা রাজকুমারী "থোইবি" জীবিত ছিলেন-ইঁহাদের উপাখ্যানকে মণিপুরীদের 'জাতীয় উপাখ্যান' বলা যাইতে পারে; এই প্রেমিক-প্রেমিকার কথা-বীর যুবক খাম্বা-র নানা বীরকার্য্য দেখাইয়া, শত্রুর নানা ষড়যন্ত্র ও বিরোধকে ব্যর্থ করিয়া, রাজকুমারী থোইবিকে বিবাহ করা, ও শেষে খাম্বা-র নির্বুদ্ধিতায় উভয়ের মৃত্যু, প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত গাথা মণিপুরীরা এখনও গান করিয়া থাকে; এবং এই উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক মণিপুরী কবি নাটক লিখিয়াছেন,ও আধুনিক মণিপুরের প্রধানতম কবি স্বর্গীয় হিজম আঙাঙ্ হাল সিংহ ৩৯,০০০ ছত্রের এক বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। খাম্বা-থোইবির উপাখ্যান মণিপুরীদের সম্বন্ধে প্রামাণিক ইঙরেজী গন্থ T.C. Hodson [হডসন] রচিত The Meitheis (london, 1908) তে পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় তাঁহার "বিচিত্র মণিপুর" পুস্তকে (২য় সংস্করণ, ১৩৫৩) ইহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন।

পুরাণ ছাড়িয়া আমরা মণিপুরের ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পঁহুছাই রাজা কিয়াম্বা বা ক্যাম্বার সময়ে (রাজত্ব কাল, খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকে; ইনি শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ছিলেন)। ইঁহার সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকারের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মণিপুর রাজবংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখা যায়। মণিপুরে ব্রাহ্মণের বাসও হইতে থাকে। "পামহেইবা" বা গরীবনিবাজ অথবা গোপাল সিংহ অষ্টাদশ শতকে (১৭০৯-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) বিশেষ প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। ইনি রামানন্দী গোঁসাই শান্তদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, মণিপুরে রামচন্দ্রের উপাসনা প্রবর্তিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "মোয়াম্বা" বা গৌরশ্যাম সিংহ মণিপুরের রাজা হন। ইঁহার নাম হইতে বুঝা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গৌরশ্যামের পরে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ (বা "চিঙ্‌আঙ্‌-থাম্বা"), ১৭৫৯ হইতে ১৭৯৮ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; তাঁহার আমলে মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম রাজার, রাজবংশের ও জনসাধারণের ধর্ম রূপে গৃহীত হয়। নবদ্বীপ হইতে গোস্বামী ও ব্রাহ্মণগণ আসিয়া মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন।

মণিপুরের প্রাচীন দেবতা-বিষয়ক উপাখ্যানগুলি পূর্ণভাবে আলোচিত হয় নাই। আদিম মণিপুরী পুরাণ সমস্ত-ই প্রাচীন মণিপুরী ভাষায় লিখিত। "নুমিৎকাপ্পা" বলিয়া একটি প্রাচীন পুরান কথা হডসন সাহেব তাঁহার বইয়ে প্রাচীন মণিপুরীতে, আধুনিক মণিপুরী ও ইংরেজী অনুবাদের সহিত, প্রকাশিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত নলিনী ভদ্র ইহার বাঙ্গালা করিয়া দিয়াছেন। মণিপুরী ভাষা কবে প্রথম লিখিত হয়, তাহা জানা যায় না। প্রাচীন মণিপুরী বর্ণমালায় এই সমস্ত পুরাণ কথা পুঁথি পাওয়া যায়, সেগুলির আলোচনার সুত্রপাত ও ভালো করিয়া হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পরে মণিপুরীরা বাঙ্গালা লিপি গ্রহণ করিয়াছে; এখন মণিপুরী ভাষা বাঙ্গালা লিপিতেই লিখিতও মুদ্রিত হইয়া থাকে-কিন্তু কয়েকজন মণিপুরী লেখক ও স্বজাতীয়-সংস্কৃতি-প্রিয় অন্য ব্যক্তি, পুরাণো বর্ণমালাকে আবার ফিরাইয়া আনিবার আকঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় আছেন।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত গবেষক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে নতুন কিছু বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই উপমাহাদেশে যেকজন গবেষক সারাবিশ্বের খ্যাতি কুড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর "সাংস্কৃতিকি" নামক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। যদিও লেখাটি অনেক আগের লেখা তথাপি এর গুরুত্ব এখনও বর্তমান। তাছাড়া এখানে অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আছে যা মণিপুরী মীথ সম্পর্কে এক সম্যক ধারণা দিতে পারে। এসব দিকবিবেচনা করে প্রবন্ধটি এই সংকলনের অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

মণিপুরী নৃত্যে দুটি ধারা

দেবযানী চলিহা

পাটকাই পর্বতমালা পরিবেষ্টিত মণিপুর একটি উপত্যকা। নাগা, কুকী, মিজো ও তাদের অসংখ্য উপজাতি পার্বত্য এলাকায় বাস করে। প্রত্যেকের ভাষা আলাদা, জীবন ধারা পৃথক। উপত্যকা ভূমির অধিবাসী মৈতে জাতি, যাদের সাধারণত মণিপুরী বলা হয়। তারা যে ভাষায় কথা বলে তা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা মৈতে। পার্বত্য এলাকার বেশীর ভাগই খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেছে, শুধু মৈতৈরা বৈষ্ণব ধর্মকে সম্পূর্ণ নিজের করে নিয়েছে।

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকে মৈতৈরা, অন্যান্য সব জাতির মতো বনদেবতা, বনদেবীর পূজা করে আসছে। নোংপোক নিংথৌ-পানথৈবী, ইবুধৌ থাংজিং-লাইরেম্বী, ইত্যাদি নামে এই দেবতারা খ্যাত। বনদেবতা আরাধনার কেন্দ্র স্থল মৈরাং। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা মাঝখানে স্ফটিক স্বচ্ছ জলের বিশাল হ্রদ লোকতাক-এপার ওপার দেখা যায় না। সেই লোকতাক হ্রদের ধারে মৈরাঙ পুরাকালে মৈতে সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল। লোকতাক হ্রদে ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় ছেলে মেয়েরা যাত্রী ও পারাপার করে এবং গান করে। সেই গান পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। মৈরাং ও লোকতাককে ঘিরে মণিপুরে লোক গাথার শেষ নেই-মৈরাং পর্ব মৈতৈদের অতিপ্রিয় লোক কাহিনী। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত এই কাহিনীটি খাম্বা ও থৈবীর প্রেমকে অমর করে রেখেছে। রাজকুমারী থৈবী ও সুদর্শন কৃষক যুবক খাম্বা প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। রাজ বংশজাত নয় বলে খাম্বা অনাদৃত। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে প্রেম জয়ী হলো। কিন্তু রোমিও জুলিয়েটের মতো খাম্বা-থৈবীও মৃত্যুকে তাঁদের মিলন সাথী করে নিলেন। বনদেবতার পূজা করা হয় লাই হারাওবা উৎসবে পৌরোহিত্য করেন মহিলা পুরোহিত মাইবী ও পুরুষ পুরোহিত মাইবারা। মাইবারা কিন্তু মাইবীদের মতই পোষাক পরেন-সাদা ফনেক (নিম্নাঙ্গের আবরণ) ও বিশেষ ধরনের পার দেওয়া সাদা ইনেফী (চাদর)। লাই হারাওবাতে পেনা নামক, ছড় দিয়ে বাজানো একটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ছড়ের সঙ্গে লাগানো থাকে ঘুঙুর-তালবাদ্যের কাজও করে তা।

লাই হারাওবা শুরু হয় লাই পুং অর্থাৎ দেবতাকে জাগ্রত করা ক্রিয়া দিয়ে। মাইবা পেনা বাজান, মাইবী তার তালে তালে জলাশয়ে নিমজ্জিত দেবতাকে জাগ্রত করেন ও দৈবাবিষ্ট হয়ে সেই দেবতাকে নিয়ে আসেন ও তাঁর নৃত্য পূজা শুরু করেন। নৃত্য পূজার মাধ্যমে মাইবী সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ দেন। পৃথিবীর সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি। মানুষের ব্যবহারের জন্য গৃহনির্মাণ, কাপড় বোনা ইত্যাদির বর্ণনা করেন। এ নৃত্য কঠিন নিয়মানুগ। অতি গোপন ও জটিল এর তথ্য। শুধু মাইবীরাই গুরু পরম্পরা হিসাবে এ শিক্ষা পেতে পারেন। নৃত্য প্রসঙ্গে

মাইবীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাইবীর সৃষ্ট নৃত্যই মণিপুরী ধ্রুপদী নৃত্যের অঙ্কুর বিশেষ। নানা প্রকার লৌকিক হস্তমুদ্রা তাঁর ব্যবহার করেন। তান্ত্রিক হস্তমুদ্রার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মাইবী নৃত্য পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে পরে ধ্রুপদী নৃত্যে পরিণত হয়েছে। লাই হারাওবা উৎসব আজও মহাসমারোহে পালিত হয়। মন্দির চত্বরে, খোলা মাঠে এ উৎসব পনেরো দিনব্যাপী চলে। সেখানে মাইবীদের নৃত্য পূজাকে কেন্দ্র করে শতাধিক ছেলে মেয়ে নিজেদের দেবতা মনে করে নাচতে নাচতে আরাধ্য দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যায়। খাম্বা থৈবীর প্রেম কাহিনী স্মরণ করে খাম্বা-থৈবী নৃত্য অর্ঘ্য দেবতার কাছে নিবেদন করে। মেয়েরা নাচে লৈশা জাগোই-কুমারী নৃত্য। সে নৃত্যে শরীর আন্দোলিত হয় মৃদু হাওয়ায় সুপারি গাছ যেমন নড়ে, সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটার সঙ্গে অন্যটা মিশে যায়। মাইবীর নৃত্য কঠিন নিয়মে বাঁধা। পূজা রীতির মতই এ নৃত্যধারা অপরিবর্তনীয়। কিভাবে হাত যাবে, শরীর বেঁকবে, ক বার কোনদিকে ফিরতে হবে-সব নির্ধারিত। এ নৃত্য যদিও লোকনৃত্য বলে বিবেচিত, ধ্রুপদী নৃত্যের শৃঙ্খলা এতে পুরো মাত্রায় পাওয়া যায়।

পুরাকালে মাইবীরা শুধু পুরোহিতই ছিলেন না। তাঁরা একাধারে বদ্যি, জ্যোতিষ সব-ঐহিক ও পারলৌকিক সব বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। এখনকার সমাজে ডাক্তার বদ্যি থাকলেও মৈতৈদের জীবনধারায় মাইবীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মণিপুরে সবচেয়ে বড় উৎসব য়াওশং-হোলি। হোলির সময় ছেলেমেয়েরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে সারা রাত ধরে নাচে 'থাবাল চোংবা'। থাবাল অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র ও চোংবা মানে লাফানো। চাঁদের আলোয় লাফিয়ে নাচ-এ উৎসব একমাস ধরে চলে। খোলা মাঠে নইলে কারো বাড়ীর বড় উঠানে, ঢোলকের বাজনা ও গানের সঙ্গে আনন্দ নৃত্য করে ছেলেমেয়েরা সারা রাত ধরে। আনুষঙ্গিক লোকগীতে থাকে খাম্বা থৈবী প্রমুখ বিভিন্ন প্রেম কাহিনীর বর্ণনা।

লাইহারাওবা গোষ্ঠীর নৃত্য ছাড়া মণিপুরে আরও একটি ধারা আলোচনার দাবী রাখে তা হলো যুযুৎসু কলা-তমুখনা ও থাং তা জাগোই। বিনা অস্ত্রে আত্মরক্ষার কলা তমখনা। থাং-অর্থে তলোয়ার ও তা-অর্থে বর্শা। তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিমায় রচিত এ নৃত্যকলা শুধু পুরুষরাই করে। থাং জাগোই-তলোয়ার নৃত্য ভয়াবহ রূপ নেয় যখন একজনের বুকের ওপর আস্ত লাউ রেখে অন্যজন চোখ বাঁধা অবস্থায় সে লাউ দু টুকরো করে কাটে। এ নৃত্যের পদগতি ও মাত্রা গাণিতিক ছকে বাঁধা অবস্থায় সে লাউ দু টুকরো করে কাটে। এ নৃত্যের পদগতি ও মাত্রা গাণিতিক ছকে বাঁধা। এর তালিম শুধু থাং-এর গুরুই দিতে পারেন। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ নৃত্য খুব সমাদর লাভ করেছে। 'তা জাগোই' অর্থাৎ বর্শা নৃত্যের পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। বনে শিকার করতে গিয়ে বর্শার সাহায্যে কি ভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় ও পরে শিকার করার জন্য কি ভাবে তা ব্যবহার করা হয়, তার ভিত্তিতে রচিত এ নাচ শুধুমাত্র পুরুষরাই করে।

এ ছাড়া মণিপুরে আছে পার্বত্য এলাকার অসংখ্য উপজাতিদের নিজেদের লোকনৃত্যসম্ভার। তাদের পোশাক, শিরাভরণ ও নৃত্যবৈচিত্র মনকে অভিভূত করে দেয়। এতক্ষণ যা আলোচিত হল সবই প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে মণিপুরবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে আছে। কালের স্রোতে তারা বিলীন হয়ে যায়নি। মণিপুরের লোকনৃত্য সম্ভারে তারা আজও সমান মর্যাদায় বিরাজ করছে। লাই হারাওবা আজও গ্রামে গঞ্জে, শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সমান উৎসাহে থাবাল চোংবা হয় সারারাত। থাং তা আবার নতুন উদ্যম পেয়েছে। মৈরাং-এ লাই-হারাওবা এখন অনুষ্ঠিত হয় মৈরাং-হারাওবা নামে।

যদিও আধুনিক যুগের ছোঁয়া লেগে অনেক ছেলেমেয়ে পপ গান সহ আধুনিক জীবনধারায় আকৃষ্ট হয়েছে, তবু এই সব পুরানো ঐতিহ্য এখনও বেঁচে আছে।

মণিপুরের ঐতিহ্য মূলতঃ ভারত-মোঙ্গলীয়, যদিও ইতিহাসের ধারায় তা আর্য ও দ্রাবির সভ্যতার সঙ্গে মিশে একটি নিজস্ব রূপ নিয়েছে। যে তান্ত্রিক সূত্রটি কাশ্মির থেকে শুরু করে নেপাল, ভুটান, কামরূপ ও বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার রেশ মণিপুরে স্পষ্ট। লাই হারাওবাতে পুরাণ-তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মাইবীর পূজারীতিতে তান্ত্রিক সাধনার আভাস পাওয়া যায়। ভোট-বর্মী ভাষা ভিত্তিক মৈতে ভাষা সংস্কৃতভিত্তিক ভাষার চেয়ে ভিন্ন।

॥২॥

আজ থেকে প্রায় পাঁচ শ বছর আগে, মধ্যযুগে মণিপুরে ক্যাম্বা নামে এক রাজা ছিলেন (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭-১৯০৪)। পংদের নৃপতি কেখোম্বা বন্ধু ক্যাম্বকে সোনার বাটায় উপহার দিলেন একটি সোনার বিষ্ণুমুর্তি। অতি আদরের এদুটি উপহার রাজা ক্যাম্বা যত্নসহকারে রাখতেন। একদিন রাজার শরীরে অস্বস্তি হওয়াতে তিনি সেই বিষ্ণুমুর্তিটি দিয়ে শরীর চুলকে ছিলেন। অমনি তাঁর শরীর ফুলে গেল এবং চুলকানি অসম্ভব বেড়ে গেল। রাজকোষের কোনো ওষুধেই তার উপশম করা গেল না। অবশেষে রাজ পুরোহিত শিরোমণি মাইবী হাঞ্জাবীকে ডাকা হলো। তিনি দৈব্যাবিষ্ট হয়ে নৃত্য পূজা শুরু করলেন; দৈবাদেশ পেলেন "এ রোগ --রবে যদি সোনার বিষ্ণুমুর্তিটি কোন ব্রাহ্মণ এসে পূজা করেন।"

তৈরী হলো মন্দির, বিষ্ণুমুর্তিটি তাতে স্থাপন করা হলো। (বিষ্ণুপুর নামে এক গ্রামে এই মন্দিরটি এখনও আছে) মন্দিরের ভার দেওয়া হলো ভবানীনাথ নামে এক ব্রাহ্মণকে। এই ভবানীনাথ মণিপুরে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। ভবানীনাথ ছিলেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য রঘুনাথ ভট্টচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। হয়গ্রীব ছিলেন তাদের ইষ্টদেবতা। সেই সুবাদে বিষ্ণু আরাধনার সব রীতি তাঁর জানা ছিল। কিন্তু ভবানীনাথ স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে একটি সরল ও সুন্দর উপাসনা রীতির প্রবর্তন করলেন। ফল ফুল ও নৈবেদ্য অর্পণ, বিষ্ণুর স্তোত্র পাঠ, বিষ্ণুর সহস্র নাম ও কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে দশাবতার

স্তোত্র কীর্তন-এই ছিল পূজার উপকরণ। ঘন্টার অভাবে দু খন্ড লোহা দিয়ে শব্দ করা হতো।

সে সময় বঙ্গদেশের কয়েকজন কীর্তনীয়া মণিপুরে এসেছিলেন। মন্দির পেয়ে তাঁরা মহা খুশী। সন্ধ্যা আরতির সময় মন্দিরে এসে তাঁরা কীর্তন করতেন। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্য রাজা উপহার দিলেন একটি পুং অর্থাৎ মৃদঙ্গ। এই পুং তৈরী হয়েছিল রাজ দরবারের ব্যবহৃত খুনবুং বাদ্যযন্ত্র ও বাংলার মাটীর খোলের সংমিশ্রণে-একটি অভিনব আবিষ্কার। কীর্তন জমে উঠল পুং-এর সহযোগিতায়। সঙ্গে লোহার ঘন্টা তো ছিলই। বিষ্ণুর উপাসনার জন্য এভাবে একটি নতুন কীর্তন ধারার সূত্রপাত হলো।

রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার বাড়তে লাগল। ভক্তরা দুর দূর দেশ থেকে আসতে লাগলেন, নিজেদের কীর্তনের ধারা প্রবর্তন করতে লাগলেন, নতুন গীত রচনা করতে লাগলেন। বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে মৈতৈভূমি মেতে উঠল। সে প্লাবন যুবক যুবতীদেরও আকৃষ্ট করল। তারা নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করল। বৈষ্ণব ধর্মকে তারা আপন করে নিল।

ঝাঁঝ ও 'মৈবুং' অর্থাৎ শঙ্খ আনলেন কৃষ্ণভক্ত নিমাত্তী ব্রাহ্মণ বনমালী রায়। তাঁর প্রভাবেই নৃপতি তুবিচরাইরোঙবা তৈরী করলেন মদন মোহনের মন্দির ও একটি কীর্তনীয়া দলকে ভরণ পোষণ করার দায়িত্ব নিলেন। মণিপুরে কীর্তন প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হল এই সময়েই। পরবর্তী পালা কীতনের সূত্রপাত এখানে।

মৈতৈরা স্বভাবত সৃজনশীল। কীর্তনের প্রবর্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন গীত, তাল ও রাগ সৃষ্টি করলেন গুরুরা। মহারাজ গরীব নিয়াসের আমলে (১৭০৯-১৭৪৮ খ্রীঃ) বঙ্গীয় পালা কীর্তনের আদলে, দেশী সঙ্গীত ধারার মিশ্রণে তৈরী হলো বঙ্গদেশ পালা। মহাজন পদাবলী থেকে গীত নিয়ে, দেশী সুরের সঙ্গে মিশিয়ে একটি নতুন ধারার উদ্ভব হলো। করতালও এ সময় এল, তবে একে বলা হতো রামতাল। পরে এ করতাল সঙ্গীতোপযোগী করে তৈরি হলো মৈতৈ করতাল। বঙ্গদেশ বা অরীবা পালা এখন রাজবাড়ীতে গাওয়া হয়। এর নিগূঢ় তত্ত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুরু শুধু এখনও জানেন।

বঙ্গদেশ থেকে যারা এসেছিলেন তারাও মৈতৈ দেশী সঙ্গীতকে নিজের করে নিয়ে নতুন ধাঁচে সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন- সেই গুরুদের মধ্যে রাধা, রূপ ও শ্যামার নাম অন্যতম। বঙ্গদেশ পালা মণিপুরে এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে রাজন্যবর্গও এ কীর্তনের তালিম নিতেন। এভাবেই শুরু হলো রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের রাধাভার কীর্তন, এবং রাধাভাব কীর্তন থেকেই মণিপুরী রাস নৃত্যের শুরু হয়েছিল-ভক্তিভাব সম্ভূত নৃত্যকলার এ থেকেই সূত্রপাত।

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র যখন রাজ সিংহাসনে বসলেন তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মৈতৈ ভুমির প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। মহারাজ দৈব আদেশ পেলেন যে কায়না পর্বতে একটি বিশেষ স্থানে কাঠাল গাছ আছে। সে গাছের কাঠ দিয়ে কৃষ্ণ মূর্তি তৈরী করে মন্দিরে স্থাপন করতে

হবে ও রাস নৃত্যপূজা করতে হবে। সে আদেশ সত্য প্রমাণিত হলো যখন নির্দিষ্ট স্থানে সত্যি কাঠাল গাছটি পাওয়া গেল। তা দিয়ে তৈরী হলো কৃষ্ণ মূর্তি তৈরী হলো সে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোবিন্দজীর মন্দির (১৭৭৯ খ্রীঃ) এই মন্দির আজও মণিপুরের প্রধান তীর্থ-স্থান।

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র প্রবর্তন করলেন রাস নৃত্যপূজার রীতি, পুং ও করতাল সহেযাগে সঙ্কীর্তন সমারোহ-নট সঙ্কীর্তন। সে পূন্য সঙ্কীর্তনে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র ছিলেন মুখ্য বাদক। তাঁর খুল্লতাত শ্বেতসাই ছিলেন গায়ন ও শ্রীধরসাই দোহারের একজন। রাসে মহারাণী হীরামতি নিলেন গোপী প্রধানা 'মকোক্‌চিংবী' ললিতার ভূমিকা এবং রাজকন্যা 'বিম্বাবতী' হলেন রাসেশ্বরী রাধারাণী। কৃষ্ণ ও রাধার ভূমিকায় পাঁচ-বছর বয়সের ছেলে মেয়েকেই নেওয়া হয়। মনে করা হয় যে তার চেয়ে বড় হলে ঐশ্বরিক শক্তি তিরোহিত হয়ে যায়। এ প্রথা এখনও রাসে মেনে চলা হয়। ঐহিহাসিক এই সঙ্কীতর্ন ও রাস মণিপুরের উপাসনা রীতিতে এক যুগান্তকারী বিবর্তন এনে দিল।

বঙ্গদেশ পালা, রাধাভাব সঙ্কীর্তন ছাড়াও নানা প্রকার কীর্তন রীতি এ সময় প্রচলিত ছিল। সঙ্কীর্তন ও রাস পরিমার্জিত হয়ে উঠল সৃজনশীল গুরুদের রচনায়। গায়ন পদ্ধতি পরিবর্তিত হলো। পরিশোধিত হলো দেশী গায়ন পদ্ধতির সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ষ্টাইল তৈরী হয়ে গেল। প্রবাসী কীর্তন মৈতৈ ভূমিতে নবজন্ম লাভ করল।

পরবর্তী রাজারা সঙ্কীর্তনের এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দান করেছ্নে। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুরা তাঁদের প্রতিভাবে প্রষ্ফুটিত করেছেন, সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ মানের নৃত্য গীত। রাজর্ষি বাগ্যচন্দ্রের তিরোভাবের একশ বছর পরে চন্দ্রকীর্তি মাহারাজের আমলে (১৮৫০-১৮৮৬) খৃস্টাব্দ) মণিপুরী সঙ্কীর্তনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। চন্দ্রকীর্তি মহারাজ নিজে একজন চিন্তাশীল শিল্পী ছিলেন। গুরুদের সাহয্যে তিনি নৃত্য গীত ও বাদ্যের অমোঘ সংমিশ্রেণে সৃষ্টি করলেন অতি সুন্দর কীতন প্রণালী, পরিমার্জিত নৃত্য রীতি-ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্যের যবনিকা উন্মুক্ত হলো।

রাস গোষ্ঠীর নৃত্যকেই শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্য বলা হয়। মাইবী নৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট হলেও তা পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে সম্পূর্ণ একটি নতুন নৃত্যধারা উদ্ভুত হলো যা আজ আমরা ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্য হিসাবে পাই।

নট সঙ্কীর্তন, পাঁচটি রাস-কার্তিক পূর্নিমায় অনুষ্ঠিত মহারাস, চৈত্র পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, দিবারাস ও নিত্যরাস, কৃষ্ণের বাল্যলীলার ওপর প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠলীলা ও উদুখল, চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ওপর প্রতিষ্ঠিত গৌরলীলা-মণিপুরী ধ্রুপদী নৃত্য বলতে এদেরই বোঝায়। রাসলীলার শুরু হয় নট সঙ্কীর্তন দিয়ে। গোবিন্দজীর মন্দিরের বিশাল মন্ডপে, আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্তির সামনে ভক্ত শিল্পীরা পুং বাদন, করতাল চলম সহযোগে সঙ্কীর্তন করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি সিংহর আমল থেকে শৃঙ্গার রসের ৬৪ বিভাগকে ৬৪টি সঙ্কীর্তনের বৈঠকে বিস্তার করা হয়।

মণিপুরী কীর্তন গায়ককে নট বলা হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে নট তাকেই বলে যে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে দক্ষ, নাট্য যার আয়ত্তে, যে রসাপ্লুত হয়ে নৃত্য গীতের মাধ্যমে দর্শককে কল্পলোকে নিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে মণিপুরী নট সঙ্কীর্তন বাংলার ঠাকুর নরোত্তম দাসের লীলা কীর্তনের ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দনা গৌড়চন্দ্রিকা দিয়ে শুরু হয়ে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে চলে রাস সঙ্গীত। সঞ্চার ও বিভিন্ন তাল প্রবন্ধ-তিন তাল, দুই- তাল, রাজমেল, একতাল-একটার পর একটা। এতে পুং ও করতাল চলমের বিভিন্ন গতি পরিবেশন করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। এই গতি সমূহ অতি মনোরম, শিল্পী সুলভ-শিল্পীর দক্ষতা এতেই প্রকাশ পায়। সঙ্কীর্তনে ব্যবহৃত তালসমূহ অতি সুক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপনা রাগ-'রাগ আহৌবা'-তার পরে ছন্দের ক্রমিবকাশ হয় ব্যাঘ্র বায়ু, বৃষ্টিছন্দ ইত্যাদি শরীরের ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে।অবশেষে শরীর যখন সিদ্ধ স্তরে উপনীত হয়, তখনই শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করার উপযোগী হয়।

সঙ্কীর্তন শেষ হয় নিতাই পদ দিয়ে। নট সঙ্কীর্তনের এই ধারা এখনও বর্তমান। বাংলা, মৈথিলী, ব্রজবুলি ও মৈতৈ কবিদের পদাবলী থেকে গীত গাওয়া হয়। ভক্তিরসাপ্লুত শিল্পী ও রসিক দর্শক ভাবাবেগে গদ গদ হয়ে আবেগাশ্রু সংবরণ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই রাস মন্ডপে অবিরাম সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জোয়ার চলে। প্রশংসা মুখর রসিকজন শিল্পীকে চাদর কিম্বা পারিতোষিক উৎসর্গ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। শিল্পী তাকে প্রতিপ্রণাম করেন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

বাংলার কীর্তন মৈতৈভূমিতে নবজন্ম লাভ করেছে। দেশী সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে বাংলা কীর্তনের স্বরূপ এতই বদলে গেছে যে তাকে আর বাংলার কীর্তন বলে চেনা যায় না। তার নিজস্ব সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সঙ্কীর্তনের পর শুরু হয় রাস। সাধারণত রাসে কৃষ্ণ ও রাধার ভুমিকা দেওয়া হয় শিশু শিল্পীদের, যাদের বয়ঃসীমা পাঁচ বছর পার হয়নি, কেন না তার পরে শিশুর দৈবী শক্তি লোপ পায় এই ধারণা।

প্রতিভা সম্পন্ন শিশু শিল্পীদের তালিম নিতে হয় দীর্ঘদিন। কৃষ্ণ নর্তন, কৃষ্ণ অভিসার ইত্যাদি নৃত্য শিশুদের পক্ষে আয়ত্ত করা খুবই কষ্টকর।

তবে প্রকৃত নাট্য নৃত্য ও গীত পরিবেশন করেন গোপীরা যাঁরা রাধার সঙ্গে আসেন। গোপী প্রধানা যাকে 'মকোকচিংবী' বলা হয় তিনি নৃত্য গীতের মাধ্যমে রাসলীলার ক্রমবিকাশ সাধিত করেন। সুত্রধারী ও অন্যান্য গোপীরা তাঁকে সাহায্য করেন। রাসলীলার কেন্দ্রবিন্দু ভঙ্গ পরেং অর্থাৎ নৃত্য মালিকা। ভঙ্গী পাঁচটি-ভঙ্গী অচৌবা অর্থাৎ বড় ভঙ্গী, গোপী বৃন্দাবন পরেং, খুরুম্বা পরেং অর্থাৎ প্রণাম নৃত্য মালিকা, গোষ্ঠ ভঙ্গী ও গোষ্ট বৃন্দাবন পরেং। শেষের দুটি ভঙ্গী তান্ডবাঙ্গের। প্রথম তিনটি লাস্য অঙ্গের।

মণিপুরী নৃত্যে লাস্য ও তান্ড এ দুটি ভাগ আছে। লাস্য মেয়েদের মৃদু নৃত্য ও তান্ডব কৃষ্ণের নাচ। যদিও তান্ডবও সুকুমার তান্ডব, উদ্ধত নয়। মূলত একই পদচালনা লাস্য ও তান্ডবের; শুধু লাস্যে হবে মৃদু পদেক্ষেপ, পা গোড়ালির বেশী উঠবে না ও তান্ডবে হাঁটু অব্দি পা উঠবে ও লাফানো পদগতি থাকবে।

পুং চলম ও করতাল চলমে তান্ডবাঙ্গের পদচালনা ব্যবহার হয়। কিন্তু এ তান্ডব কৃষ্ণের তান্ডবের চেয়ে পৃথক আঙ্গিকের।

মণিপুরে বৈষ্ণব ভক্তরা মনে করেন যে ভঙ্গী এমন একটি নৃত্য শৈলী যার মাধ্যমে ভক্ত অন্তরের অন্তঃস্থলে তার আরাধ্য দেবতার প্রতিকৃতি রচনা করতে সক্ষম হয়। মহারাসে ভঙ্গী নৃত্য চলবে, যে যেখানে আছে সেখানেই তাকে থাকতে হবে। নড়া চড়া করা চলবে না। দর্শক-মন্ডলীর মধ্যে ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে রাখা হয় যাতে হঠাৎ উঠে সে না কাঁদে। ভঙ্গী অচৌবা লাস্য নৃত্য, গোপীরা এ নৃত্যের মাধ্যমে কৃষ্ণের সঙ্গে একীভূত হবার প্রয়াস করেন।

রাসলীলার মাধ্যমে ভক্ত-শিল্পীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আবেগ সুত্রে মিলিত হন। বিশেষ করে ভঙ্গী এমন একটি নৃত্যকল্প যার ভাব দৃষ্টি ও ভাব মুদ্রা ভক্ত ও ভগবানের এ মিলনকে সম্ভব করে। এ নৃত্য দর্শকের জন্য নয়, এ নৃত্য শিল্পীর অন্তরের আকুতির নৃত্য। এ নৃত্যে হয়তো তেমন চটক নেই কিন্তু ভক্ত যখন এ নৃত্যের তাৎপর্য বোঝে তখন তা তাকে ঐশ্বরিক আনন্দ এনে দেয়।

মৈতৈভূমিতে বৈষ্ণব ধর্ম যখন এলো, তখন থেকে লাইহারাওবার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মীয় উৎসব সমুহও মহা সমারোহে পালিত হতে লাগল। প্রত্যেকটি উৎসবে নৃত্য প্রাধান্য পেয়ে আসছে। রথ যাত্রার রথের সঙ্গে চলার সময় হাত তালি দিয়ে যে নাচ ও গান হয় তাকে বলা হয় 'খুবাক ইশৈ' অর্থাৎ হাত তালি দিয়ে গান। ঝুলনের সময় মন্দিরা বাজিয়ে মেয়েরা নাচে ও গায় 'নুপী পালা' অর্থাৎ মেয়েদের পালা। তাছাড়া বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা কর্ণচ্ছেদ অনুষ্ঠান সঙ্কীর্তন ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। 'গোষ্ঠলীলা' ও 'উদুখল' কৃষ্ণের বাল্যলীলা ভিত্তিক উৎসব। এতে যশোদা, রোহিণী, নারদ মুনি, কংস ও নন্দরাজা ছাড়া সবই শিশু শিল্পী অংশ গ্রহণ করে।

॥ ৩ ॥

সমসাময়িক মণিপুরে 'লাই হারাওবা' ও 'রাস'-এ দুই নৃত্যধারা সমান্তরালভাবে বিরাজ করছে। প্রাক বৈষ্ণব যুগীয় নৃত্যধারা 'লাই হারাওবা' যার কেন্দ্রবিন্দু মাইবী নৃত্য ও বৈষ্ণব যুগীয় নৃত্যধারা রাস যার কেন্দ্রবিন্দু নট সঙ্কীর্তন ও ভঙ্গী অচৌবা। 'লাই হারাওবা' নৃত্যধারাকে যদিও লোকনৃত্য বলা হয়, অত্যন্ত কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ নৃত্য বলে মাইবী নৃত্যকে পুরোপুরি লোকনৃত্য বলতে আমার মন সায় দেয় না।

লোকনৃত্যে ব্যবহৃত হয় ঢোলক ও রাস গোষ্ঠীর নৃত্য যাকে ধ্রুপদী মণিপুরী বলা হয় তাতে ব্যবহৃত হয় 'পুং' অর্থাৎ মণিপুরী মৃদঙ্গ।

মণিপুরের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও কলার একটি নিজস্ব রূপ আছে। এর এমন একটি স্বকীয়তা রয়েছে যা উপলব্ধি করতে হলে মৈতৈ মনোভাব নিয়ে তাকে দেখতে হবে। সাধারণত বাইরের থেকে যারা আসে তারা সর্বসাধারণের মাপকাঠি দিয়ে মণিপুরীদের বিচার করতে চেষ্টা করে। এ দেশের শিল্প কৃষ্টি জানবার জন্যে তারা নিজেদের ধারণার বর্ম ছাড়তে চান না। সুতরাং কিছুই জানা হয় না তাদের। ভিন্ন জগতের রসসম্ভার আস্বাদন করতে তারা অক্ষম হয়েই থাকে।

অন্যদিকে, স্বভাবত প্রগলভ মণিপুরীরা প্রায়শই মৈতৈ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় নিজেদের ভালো ভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তারা অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী। নিজেদের জাহির করাটা অশোভনীয় বলে মনে করে। ফলে নিজেদের মূল কথাটা না বলাই থেকে যায়, এবং প্রবক্তারা 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' মনে করে এক মাপকাঠিতে তাদের মূল্যায়ন করেন।

মৈতৈরা নীতি নিয়ম মেনে চলতে ভালবাসে। ব্যক্তিগত, সামাজিক বা ধার্মিক-সব ক্ষেত্রেই তারা নিয়ম মত চলে। দৈনন্দিন আহার বিহার থেকে আরম্ভ করে, বিয়ে, পূজা, সব কিছুই এক একটা পর্ব, একটা যেন অনুষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে জাপানের চা-পান পর্বের কথা উল্লেখ করা যায়।

পুরাকাল থেকে মণিপুরে নৃত্য গীত শ্রুতি ও স্মৃতির মাধ্যমে গুরুর কাছ থেকে শিষ্য শিক্ষা লাভ করে আসছে। শত বাধা বিপত্তির মাঝেও সে চিন্তাসূত্র ছিড়ে যায়নি। লাই হারাওবার বিভিন্ন নৃত্য সম্ভার থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই নিয়েমে বাঁধা। সে রীতি অতি ভক্তিভরে তারা এখনও পালন করে। রীতিনীতির এই কঠিন কাঠামো মণিপুরী জীবনের অঙ্গ। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাস ও সঙ্কীর্তনকে কখনই নাটকীয় উপস্থাপনা বলা যায় না। বস্তুত এ দুটি অতি উচ্চ মানের ধর্মভিত্তিক নান্দনিক পরিকল্পনা। এর ক্রমবিকাশ এমন যে অতি উচ্চ মানের তাল প্রবন্ধ, ছন্দ বৈচিত্র, রাগ-রাগিনী বা সংযত শরীর চালনাও প্রদর্শন বলে মনে হয় না। মূল ভাবরসের সঙ্গে এই পরিবেশন এক হয়ে যায় এবং তা সরল থেকে যত জটিল হতে থাকে, ভক্তি-ভাব ততই বাড়তে থাকে। ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্য গীত সব সময়েই মন্দির বা মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কখনই তা আমাদের জন্য মনোরঞ্জনের তাগিদে হয়নি, এমনকি রাজার দরবারেও না। তাই মণিপুরে রাজার প্রশস্তিতে কোনো গান রচিত হয়নি। রাজাই মন্ডপে আসতেন ভক্ত হয়ে নৃত্য গীতের রস আস্বাদন করতে। বেশীরভাগ রাজা নৃত্য গীতে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা রাসে অংশগ্রহণ করতেন।

পরম্পরাগতভাবে মণিপুরী নৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন জাগোই-নৃত্য, চলম-পুং বা করতাল, গোষ্ঠীলীলার নৃত্য সমূহ-প্রত্যেকটার প্রণালী আলাদা। একজন শিল্পী বিশেষ একটি ধারা নিয়েই সারা জীবন চর্চা করেন। সঙ্কীর্তনে যে দোহার করতাল চলম করবেন, তিনি তা

নিয়েই চর্চা করবেন, অন্য কিছু আর করবেন না। সমাজে দক্ষতার বিচার এত সুক্ষ্ম যে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বিশেষজ্ঞ হতেই হবে।

বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা মণিপুরী কৃষ্টির আর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। রাস মন্ডপে একজন শিল্পী যখন আর একজনের পরে এসে বাজান বা গান তখন তাকে আগের শিল্পী যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে শুরু করতে হবে এবং সে সুত্র ধরে রাখতে হবে। এক বোল বা একই প্রবন্ধ দুবার বাজালে চলবেনা।

মণিপুরী কৃষ্টির ধারাবাহিকতায় কোনো ছেদ পড়েনি। নৃত্য গীত বাদ্য চর্চা কখনও মরে যায়নি। তাই তাকে পুনর্জীবিত করার প্রয়োজন হয়নি। নদীর ধারা বয়ে চলেছে অবিরত। ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্য সংযত, ভক্তিভাব যুক্ত। চটক লাগানো, ঝলমলে নয়- নাই বা হলো অনেক উচ্চমানের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকলা আছে যা চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নৃত্যশৈলীর ধারার সাদৃশ্য পাওয়া যায় যে এ নৃত্যে চোখ মুখের কোনো অভিব্যক্তি থাকে না, মুখাভিনয় থাকে না। এই সঙ্গে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা' প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। জাভা ও বলির নৃত্য প্রসঙ্গে বলছেন : "নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত সংগীতের ভিত্তিতেই সে দেশের নাচ রচিত। তারা গানের সঙ্গে ভারতীয় প্রথার অভিনয়পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। অন্তত কথাকলির ন্যায় মুখাভিনয়, কথ্‌কের মত অভিনয় তো নয়ই। তাদের অভিনয় যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে বাঁধা সমগ্র দেহ ভঙ্গীর অভিনয়। দেহভঙ্গীর অভিনয় করতে গিয়ে তারা চোখে মুখে কোন প্রকার ভাবাভিনয় একেবারে করে না। এক দৃষ্টি, এক মুখভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের অভিনয় করতে দেখেছি। এ বিষয় পুরুষ বা মেয়েতে কোনো ভেদ নেই।"

মণিপুরী নৃত্যে অভিনয় জাভা, বলি বা তাই দেশের মত। দেহাভিনয় পাই, মুখাভিনয় সেখানে নেই এবং করলে উদ্ধত বলে মনে হবে। ভক্তি রসাপ্লুত নর্তক নতর্কী অধোবদনে বিনম্র আত্মনিবেদনের নৃত্যার্ঘ্য অর্পণ করে। এ নৃত্য কলাকৌশল দেখাবার জন্য নয়, এ নৃত্য গভীর অনুভূতি ও রসোপলব্ধির মাধ্যমস্বরূপ, ভক্তির স্থায়ী ভাবটি নৃত্য গীতের দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ নৃত্য তাই ঘুঙুর ব্যবহার করা হয় না। ঘুঙুরের শব্দে ভক্তিভাব বিঘ্নিত হয়।

॥ ৪ ॥

নট সঙ্কীর্তন ও রাস আজও মণিপুরে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। লাই হারাওবা অনুষ্ঠিত হয় আগের মতই। গোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে তেমনিই ভক্তসমাবেশ হয়, সাষ্টাঙ্গ প্রণামের জোয়ার চলে। তবে সেখানেও আধুনিক যুগের প্রভাব পড়েছে। আগের মত দীর্ঘ দিন ধরে রাসের প্রস্তুতি পর্বে নৃত্য চর্চা করার সময় কারো হয়ে ওঠে না। তালিমের অভাবে নৃত্যের মান পড়ে গেছে। পেশাদারী কয়েকজন রাসধারী ও সুত্রধারী রাসের মান কিছুটা বজায়

রেখেছে। তাদেরও নজর অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, আরাধ্য দেবতার চেয়ে ধনী দর্শকের দিকে বেশী ঝোঁকে। দর্শককে খুশী করার জন্য তারা হয়তো চালচলনে চপলতা আনে। পুং চলমে ডিগবাজির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। গোষ্ঠ লীলাতেও অনুরূপ প্রভাব দেখা যায়। তবে তারও ব্যতিক্রম আছে। ১৯৮৬ সনে গুরু হাওবাম অতোম্বা সিংহর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর শিক্ষালয়ের ছাত্রীরা যে গোষ্ঠলীলা করেছিল, তাতে শিশু শিল্পীদের নৃত্যের মান যেমন উচ্চ ছিল, প্রকৃতিও সহেযাগিতা করেছিল সমান ভাবে। ইম্ফলে, প্রয়াত গুরুজীর পূজা মন্ডপে গোষ্ঠলীলা অনুষ্ঠিত হযেছিল। মন্ডপের উত্তরে মন্দির, পুবে গোহাল ও দক্ষিণে তাঁর বাসস্থান ও বিদ্যালয়। গোষ্ঠলীলা শুরু হলো। যশোদা, রোহিণী, শিশু কৃষ্ণ ও বলরাম সহ দ্বাদশ গোপবালককে মিষ্টান্ন বিতরণ করছেন, এমন সময় শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। টিনের ছাদে বৃষ্টির অবিরাম শব্দ, সে শব্দ ছাপিয়ে বাজল পুং, শঙ্খ ও মন্দিরা,- শোনা গেল গান। গোষ্ঠলীলাতে কৃষ্ণ সহ শিশু শিল্পীদের নৃত্য উচ্চ মানের হয়েছিল।

গত একশ বছরের ইতিহাসে মণিপুরী নৃত্য জগতে এক নব জাগরণ এসেছে। শতবর্ষাধিক গুরু মৈষ্ণাম অমুবী সিংহ, গুরু হাওবাম অতোম্বা সিংহ ও গুরু অমুদন শর্মা, মণিপুরী নৃত্য জগতের ত্রিমূর্তি-মণিপুরী নৃত্যধারার নতুন যুগের পথ প্রদর্শক। তাঁরাই মণিপুরী নৃত্যক মন্ডপ থেকে মঞ্চে তুলে এনেছেন। মঞ্চ সফল নৃত্য প্রদর্শন সম্ভব হয়েছে এদের মত দুরদর্শী শিক্ষক ও এখনকার ভাষায় কোরিওগ্রাফারদের জন্য। ইম্ফলে জওহরলাল নেহেরু মণিপুরী ডান্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকে। গুরু মৈষ্ণাম অমুবীর নেতৃত্বে সে ডান্স কলেজে আজকের যুগোপযোগী নৃত্য প্রশিক্ষণের রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন নতুন পরীক্ষণ চলছে। স্থাপিত হয়েছে ব্যালে ইউনিট।

আজও মণিপুরে নৃত্য দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। কোনো উৎসব, কোনো অনুষ্ঠান-এমনকি শ্রাদ্ধ বাসরে শোক প্রকাশও নৃত্য ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। নৃত্য সেখানে পুজা, নৃত্য শিক্ষা স্নেহের দান। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য নেশা থেকে পেশায় পরিণত হয়েছে এবং নৃত্য-কল্প অর্থাৎ নৃত্য সম্পর্কে মানসিকতার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে।

মণিপুরী নৃত্যকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। তিনি রাস নৃত্য দেখেছিলেন শ্রীহট্টে এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন এ নৃত্যধারার কোমল আঙ্গিকে। যে অঙ্কুর তিনি তাঁর নৃত্য নাটিকাতে বপন করেছিলেন, আজ তা বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ 'শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা, প্রবন্ধে বলেছেন-"আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই গুরুদেবের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তিনি যদি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নৃত্যকলাকে প্রথম উৎসাহিত না করতেন, তবে আজ আমরা আমাদের দেশে নাচের প্রচারের জন্য বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও সংঘের পরিচয় পেতাম না এবং যে সম্মান আজ নাচিয়েদের আমরা দিচ্ছি, তাও এত সহজ হত কিনা কে জানে।"

স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, ভিন্ন ভাব প্রকাশে ব্যবহার হবার দরুণ মণিপুরী নৃত্যশৈলীর একটি প্রবাসী চরিত্র গঠিত হয়েছে; তার পুষ্পের রং ও সুবাস কিছু আলাদা হয়ে গেছে। সমসাময়িক কালে মণিপুরের বাইরে মণিপুরী নৃত্যের দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমটি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে। এখানে নৃত্যের ব্যবহার শুধু মূল ভাব প্রকাশ করার জন্য। নৃত্য যদি বেশী প্রাধান্য পায় তবে ভাব প্রকাশ বিঘ্নিত হবে। তাই নৃত্যনাট্যে ব্যক্তি বিশেষের নৃত্য পারদর্শিতা প্রদর্শনের স্থল খুবই সীমিত। আবার শান্তিদেব ঘোষের সাহায্য নিয়ে বলি : "গুরুদেব নিজে কখনও নাচকে খুব সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর কাছে নাচ হলো সাধারণ অভিনয়েরই একটি উৎকৃষ্ট মধুর সংস্করণ, সাধারণ অভিনয়কে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে নাচ। যেমন সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত মনের আবেগকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলে কবিতার ভাষা ও অধিকতর মধুর করে তোলে গানের সুর।"

মণিপুরী, কথাকলি, জাপান, জাভা ও বলিদেশের নাচ তাঁর নৃত্যনাটকে ব্যবহার করেছেন স্থল বিশেষে। কোমল ভাব প্রকাশে লাস্য নৃত্য ও কঠোর ভাব প্রকাশে, যেমন কোটালের নৃত্যে ব্যবহার করেছেন কথাকলি।

মণিপুরী নৃত্য কোমল কিন্তু সরল নয়। যে নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশীলনের ফলে মণিপুরী নৃত্যে স্বাভাবিক নমনীয়তা আসে, তার জন্য প্রযোজন বহু বছরের সাধনা। এখন সচরাচর যে সকল নৃত্যভঙ্গিমা নৃত্যনাট্যতে দেখা যায় তা সরলীকৃত হতে হতে একেবারে জলো হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে যে কয়েকটি মাত্র ভঙ্গিমা অতি ব্যবহারের ফলে অভিনবত্ব হারিয়ে অতি পরিচিত হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের আকর্ষণ কমে গেছে। কোথাও দেখা যায় ভঙ্গিমাগুলোর বিকৃতি এসে গেছে। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথ কখনোই চাননি যে একই শিল্পী মণিপুরী ও কথাকলি দুটো পরস্পর বিরোধী নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করবে। যে লাস্য ভাবধারার ভূমিকা নেবে সে মণিপুরী করুক এবং কঠোর ভাব প্রকাশের জন্য অন্যরা, কথাকলি করুক। একই অঙ্গে মণিপুরী ও কথাকলি আয়ত্তের চেষ্টা দু নৌকায় পা দিয়ে চলার মত। একজনের পক্ষে একটি নৃত্য পদ্ধতি আয়ত্ত করাই যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় ধারা হলো মন্ডপ থেকে মঞ্চে নিয়ে আসা মণিপুরী নৃত্য যার চরিত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। লাই হারাওবা বা রাস যখন মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় তখন শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে একটা ভাব-রসের যোগসূত্র থাকে। দু পক্ষই ভক্তি রসাপ্লুত-তাদের ভাবের আদান প্রদানে কোনো সমস্যা নেই। একজন নৃত্য পূজা করছে, অন্যজন তা দেখে নয়ন সার্থক করছে-দুজনেরই উদ্দেশ্য উপাসনা। চিত্তের এই উচ্চ স্তরে তারা কামনা বাসনা পেরিয়ে আরাধ্য দেবতার মাঝে নিজের নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যকে উপলব্ধি করে। মন্দিরে রাস অথবা লাই হারাওবার কোনো সময়সীমা নেই। সারা রাত ধরে চলে। শিল্পীর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। লাই হারাওবাতে শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করে। রাসে শিল্পীর সংখ্যা অপরিমিত।

যখন মন্ডপ থেকে মঞ্চে এই নৃত্যকলাকে নিয়ে আসা হলো তখন কয়েকটি সমস্যা দেখা দিল। প্রথমত, শিল্পী ও দর্শকের ভাব রসের ঐক্য হয়তো যারা নাচ দেখতে এসেছেন, এ নৃত্যধারা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তাই পরিবেশন রীতি বদলাতে হলো। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে, তাই পরিবেশন রীতি বদলাতে হলো। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে, তাই যে রাস সারা রাত ধরে চলত, তা সংক্ষিপ্ত করে আঘঘন্টার মধ্যে পরিবেশন করতে হলো। শিল্পীর সংখ্যা আট থেকে দশজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলো। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যাতে মুল ভাব রস যেন কোনো অংশে বিঘ্নিত না হয়। এ কাজ খুবই কঠিন। এ অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে গুরু অমুবী প্রমুখ সৃজনশীল শিল্পীদের জন্য। তা যদি না হতো তবে মণিপুরী নৃত্য মণিপুরের বাইরে আসতে পারতো না বাইরের জগত এ নৃত্যের রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত রয়ে যেত।

মঞ্চে আসার সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যকে আরও একটি চারিত্রিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মন্ডপে নৃত্য পূজা ছিল উপাসনা, মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শন করা হয় মনোরঞ্জনের জন্য। সুতরাং প্রয়োজন হলো বৈচিত্র্যের। বৈচিত্র্য থাকবে, কিন্তু ধারা অব্যাহত থাকবে-তার পরিকল্পনা ও নৃত্যরচনা-সেও কঠিন কাজ। মণিপুরী নৃত্যের ত্রিমূর্তি-গুরু মৈষ্ণাম অমুবী, গুরু হাওবাম অতোম্বা ও গুরু অমুদন সনাতনপন্থী মনোভাব নিয়েও এ পরিবর্তনের মোকাবিলা করেছিলেন।

বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে আমরা যেন মূল ভাব থেকে সরে না যাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ কেউ মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করতে গিয়ে বেশী অভিনয় করে ফেলছেন-এতে নৃত্যধারার চরিত্র ব্যাহত হয়। মণিপুরী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য তার শান্তশ্রী, তার ভক্তিময়তা, তার নম্র মুখরতা। সে উদ্দাম আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত। মণিপুরী নাচে আলাদা ভাবে কোনো হস্তের, কোনো ভ্রূভঙ্গীর কিম্বা মুখমন্ডলের কোনো অভিব্যক্তির গুরুত্ব দেওয়া হয় না। জাহির করা হয় না তাল লয়ের কালোয়িত। সবকিছু মিলিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় একটি সামগ্রিক রূপকল্প। এ কাজে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-পা থেকে মাথা পর্যন্ত, একই সঙ্গে অংশ নেয়।

আজকের যুগে সবাই ছুটে চলেছে। গতি দ্রুত না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। আকর্ষণীয় কারার জন্য কেউ কেউ হয়তো সাবলীল লাস্য নৃত্যকে করে ফেলছেন অত্যাধিক দ্রুত। ভ্রমরী গতিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, লাস্যের চেয়ে তান্ডবের পদচালনার ওপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। ব্যবহার করছেন ঘুঙুর। এতে মণিপুরী নৃত্যের স্বভাব বদলে যাচ্ছে।

আজকের দিনে ঐতিহ্যের স্বকীয়তা সম্পর্কে প্রত্যেক গোষ্ঠী অত্যন্ত সচেতন, স্পর্শকাতর। তাই কৃষ্টির যথাযথ প্রতিফলন যাতে হয় তার দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। একাধারে লাই হারাওবা ও অন্য দিকে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত মণিপুরী সঙ্কীর্তন ও রাসলীলা সফল হবে, সে মন্ডপেই হোক আর মঞ্চেই হোক, যদি ভাব-রসের মাপকাঠি সে বজায়

রাখতে পারে। দর্শকের হৃদয়গত ভাবকে শিল্পী যদি আপন ভাবময় সম্বিতের সঙ্গে এক করে দিতে পারে তবেই সে নৃত্য রসোত্তীর্ণ হবে। রসোত্তীর্ণ নৃত্যকলা ব্যবহারিক প্রয়োজন ছাপিয়ে স্বার্থের ঊর্ধ্বে নিরাসক্ত পরম পরিতৃপ্তি এনে দেবে।

দেবযানী চলিহা

দেবযানী চলিহা, মণিপুরী নৃত্যে যাঁর দক্ষতা প্রবাদতুল্য। মণিপুরী নৃত্যে প্রয়োগিক বিষয়ের সাথে সাথে কঠিন তত্ত্বীয় জ্ঞানেরও চর্চা করে সাধারণ মণিপুরী নৃত্য শিল্পী থেকে নিজেকে একজন মণিপুরী নৃত্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রন্থভুক্ত এই প্রবন্ধে। উক্ত লেখাটি প্রকাশিত হয় "দেশ বিনোদন ১৩৯৪" সংখ্যায়। দেবযানী চলিহা বহুদিন মণিপুরে থেকে মণিপুরী নৃত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণা ও চর্চা করেছিলেন। পরবর্তীতে ভারতে বিভিন্ন শহরে এবং স্বদেশ ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন শহরেও মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শন করেন। তাছাড়া বিশ্ব ভারতী-তে মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষিকা হিসেবেও বহুদিন দায়িত্ব পালন করেন। মণিপুরী নৃত্যের অনেক তথ্য, সংজ্ঞা, তাল, লয়, ছন্দ সম্পর্কে হয়তো এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়নি- একথা ঠিক। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে মণিপুরী নৃত্যের মতো বিশাল একটি বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত করা কখনই সম্ভব নয়। তাই এখানে যতটুকু সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে মণিপুরী নৃত্যের বর্তমান অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

মণিপুরী প্রবাদ-প্রবচন (পাউরৌ) ও লোক সংগীত

এ.কে.শেরাম

ভাষা যখন মানুষের আয়ত্বে এলো : আকার-ইঙ্গিতের পরিবর্তে ধ্বনি ও শব্দের বিন্যাসে যখন মানুষ তার মানসিক ভাব-বিভাবের দ্যোতনা প্রকাশ করা শিখলো-তখন থেকেই শুরু হলো লোক সাহিত্যের অন্তহীন পথচলা। জীবনের বিশাল প্রেক্ষাপটে মানুষ প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয় আনন্দ-বেদনা, ভয়-ভীতি, বিস্ময়-বিমুগ্ধতার বহুকৌনিক আবেগের নানায়তনিক মুহূর্তের। মানুষের ক্রিয়াশীল হৃদয়ে তখন অনুভূতির বুদবুদ ওঠে-ভাষার বহুবর্ণা পাখনায় ভর করে ভাবনার পাখিরা আকাশে ওড়ে। এভাবেই জন্ম নেয় গীতি কবিতা, গান, গল্প-গাঁথা, ধাঁ ধাঁ ও প্রবাদ প্রবচন। আর এগুলোই প্রজন্ম পরম্পরায় লোক মুখে মুখে গীত হয়ে, কথিত হয়ে, বাহিত হয়ে-নিত্য নতুন সংযোজনে, পরিবর্তন- পরিবর্ধনে সমৃদ্ধ হয়ে একালের প্রাণ প্রবাহে মিশে মননশীল মানুষের হৃদয়স্পন্দনে অনুরনন তোলে। এসবই লোকসাহিত্যের নানা উপচার। কিন্তু এগুলোর জন্মের কোন ঠিকুজি নেই- কবে, কে, কেন এবং কোন প্রেক্ষাপটে লোকসাহিত্যের এসব উপাদান সমূহ সৃষ্টি করেছেন-তা কেউই জানেন না; আর জানার কোন আগ্রহবোধও কারো নেই। লোকসাহিত্যের এসব উপকরণগুলো বুনো ফুলের মতো পরিচর্য্যাহীনভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই বেড়ে ওঠে এবং একসময় তার সৌগন্ধ যখন মানুষের শীলিত হৃদয়কে স্পর্শ করে তখনই সে ফুল নিভৃত অরণ্যের অবহেলিত প্রান্তর থেকে উঠে আসে সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের মনের মনিমঞ্জুষায়। তারপর হৃদয়ের অমল পক্ষপাতিত্বে পেয়ে ধীরে ধীরে এগুলো হয়ে যায় কালজয়ী স্মৃতির মিনার।

লোকসাহিত্য একটি প্রবহমান ধারা। নদী যেমন তার দুকূলের নানা ঘাত-অভিঘাত সয়ে-ভেঙে গড়ে- বাঁক পরিবর্তন করে এগিয়ে যায় পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে; তেমনি লোক সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ ধারাও নানা সময় এবং কালকে অতিক্রম করে-নানা অবস্থান এবং প্রেক্ষাপটকে হৃদয়ে ধারণ করে নানা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে অনাদিকাল থেকে অবিশ্রান্ত বয়ে চলে অনন্ত মহাকালের দিকে। আর তাই, লোক সাহিত্যের অন্তর্লোকে বিম্বিত হয় একটি জাতির, একটি মনুষ্য সমাজের অতীত জীবনেতিহাসের অকপট চিত্ররূপ। লোকসাহিত্যের নানা বর্ণদ্যুতিতে বিচ্ছুরিত হয় একটি জাতির শৌর্য-বীর্য, গৌরব-গাঁথা, বিরহ-বিষাদ, লোকাচার, এবং জীবন প্রবাহের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত আলোকরশ্মি। তাই লোকসাহিত্যে বিধৃত থাকে একটি জাতির-একটি জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহের প্রকৃত প্রতিফলন। আর সে কারণেই জাতির ইতিহাস নির্মাণে-জাতীয় চরিত্রের সঠিক চিত্রনে লোকসাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের অন্যতম হলো প্রবাদ-প্রবচন। গ্রীকদের মতে প্রবাদ হলো-"a wayside saying' embodying a moral lesson or obvious truth.",

Betrund Russell প্রবাদকে "one man's it and all men's wisdom" বলেছেন। অপরপক্ষে Aristotle এর মতে-"a proverb is a ramnant from old philosophy, preserved amid countless destructions by reason of its brevity and fitness for use "আবার Abbe' de saint-Pierre এর মতে প্রবাদ হলো-"echose of experience" সুতরাং মানুষের দীর্ঘ জীবনাচরণে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও নানা অভিজ্ঞতার জরায়ু থেকে জাত সত্য ও প্রজ্ঞার রৌদ্রস্নাত যে সব উচ্চারণ সার্বজনীন আবেদন নিয়ে চিরায়ত কালের প্রবাহে টিকে যায়-সেগুলোই প্রবাদ-প্রবচন। নানা আঞ্চলিক শব্দ ও বোধের ব্যবহারে, নানা শিল্পিত বাক প্রতিমার প্রয়োগে এবং ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক নানা অভিজ্ঞতার প্রকাশে এসব উচ্চারণগুলো লোক সাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসে একগুচ্ছ দীপ্যমান নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রবাদ-প্রবচনগুলোতে যেমন থাকে নানা উপদেশাবলী, জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, তেমনি আছে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শানিত প্রকাশ।

মণিপুরী লোকসাহিত্যে মণিপুরী 'পাউরৌ' বা প্রবাদ-প্রবচনগুলোর অবস্থান আপন দ্যুতিতে ভাস্বর। প্রায় দেড় সহস্র প্রবাদ-প্রবচন, মণিপুরী সমাজে প্রচলিত আছে বলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে প্রকাশ। মণিপুরী 'পাউরৌ' বা প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা দেয়ার লক্ষ্যেই নীচে মোট ৫০টি নির্বাচিত প্রবাদ-প্রবচন সংকলিত হলো। বৈশিষ্ট্য ভেদে এ গুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ- ক) উপদেশাত্মক, খ) জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রকাশক এবং গ) ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে প্রতিটি প্রবাদ-প্রবচনের সাথে সাধারণ অর্থ এবং তুলনীয় বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের উল্লেখও করা হলো।

ক) উপদেশাত্মক ঃ

(১) তরাগী চৈশুনা লেংথোন ফায়।

অর্থ - দশজনের লাঠিতে একজনের বোঝা হয়।

তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- দশের লাঠি একের বোঝা।

(২) পুক ফবগী শরুক লৈতে।

অর্থ- ভাল মানুষের অংশ নেই।

বাংলা প্রবাদ- সিধা মানুষের হুদা ভাত।

(৩) ঙাখা-না ঙারেন হৌদবনি।

অর্থ-ডানকানা মাছের তরকারী দিয়ে ভোজ হয় না।

বাংলা প্রবাদ-চক্ চক্ করলেই সোনা হয় না।

(৪) শামু ময়া থিন্দোরকপা

মঙেঁ থেঙ্গুঁনা য়েশনবা যাদবনি।

অর্থ-হাতির দাঁত বেরুলে শক্ত মুগুরের বাড়িতেও আটকানো যায় না।

বাংলা প্রবাদ-জ্বলন্ত অঙ্গাঁর ছাই দিয়ে ঢাকা যায় না।

(৫) ওয়াতোন্না ওয়াংঙবদি ক্কাক্না ফমদেকই।

অর্থ-বাঁশের মাথা যদি খুব উঁচু হয় তবে কাক বসে তা ভেঙে ফেলে।

বাংলা প্রবাদ-উঁচু গাছেই ঝড় লাগে বেশী।

(৬) হৈনৌ পাম্বীদা থৈবোং পান্দবনি।

অর্থ- আম গাছে কাঁঠাল ধরে না।

বাংলা প্রবাদ-আমড়া গাছে আম ধরে না।

(৭) অখোংবা হুই চিক্তবনি।

অর্থ-যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর কামড়ায় না।

বাংলা প্রবাদ-অসারের তর্জন গর্জনই সার।

(৮) ইখুৎ লাম্থোক্লগা মীখুৎ লাম্থোক্লকপনি।

অর্থ-নিজে হাত বাড়ালে অন্যেও হাত বাড়ায়।

বাংলা প্রবাদ- যেমন কর্ম তেমন ফল।

(৯) খোঙ চোৎলা চীন চোৎপনি।

অর্থ-পা ভিজলে মুখও ভিজে।

বাংলা প্রবাদ-দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।

(১০) ইঙ্খোলদা কৈথেল তিলহল্লু।

অর্থ-ঘরের সীমানাতেই বাজার বসাও। অর্থাৎ নিজের ক্ষেতে নিজেই সব ধরনের শাক শবজীর চাষ করো।

বাংলা প্রবাদ-পরিশ্রমই সৌভাগ্যের মূল।

(১১) লিনসু শিবা চৈসুসু তেক্তবা।

অর্থ-সাপ ও যেন মরে, লাঠিও যেন না ভাঙ্গে।

বাংলা প্রবাদ-সাপ মরলো, লাঠি ও ভাঙলো না।

(১২) অরীকপগী মরল শুন্না চায়।

অর্থ- কৃপন লোকের ধনসম্পদ ঘুনপোকায় খায়।

বাংলা প্রবাদ-কৃপনের ধন ঘুনে খায়।

(১৩) উৎতা ঘি হৈবা।

অর্থ - ভস্মে ঘি ঢালা।

বাংলা প্রবাদ-ভস্মে ঘৃতাহুতি।

(১৪) কৈনবু ময়েক মাঙবরা?

অর্থ-বাঘের দাগ কি কখনো মুছে যায়? অর্থাৎ বাঘের স্বভাব কখনো যায় না।

বাংলা প্রবাদ-স্বভাব যায় না ম'লে।

(১৫) হা উরোক, মাঙসু লাং-তুংসু তেন।

অর্থ- হে বক, তোমার সামনে ফাঁদ পাতা-পেছনে ধনুর্ধারী।

বাংলা প্রবাদ-জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ।

(১৬) ঈশিং থন্দবা চফু মখোল থোকই।

অর্থ- জলে পূর্ণ নয় এমন পাত্র শব্দ করে বেশী।

বাংলা প্রবাদ-ফোঁপড়া ঢেঁকির শব্দ বেশী।

খ) জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য প্রকাশক ঃ

(১) চপ্ল চপ্ল তেনশিল্লি

মল্ল মল্ল শোল্লক্লি।

অর্থ-কাটতে কাটতে ছোট হয় আর বাছতে বাছতে নরম হয়।

বাংলা প্রবাদ-ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

(২) য়াহৌ ঙনবা হকচাং ফৈ

খোঙহৌ হানবা লমজেল থোই।অর্থ-ভোরে উঠলে শরীর ভাল থাকে আর আগে গেলে দৌড়ে জিতে।

বাংলা প্রবাদ- সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।

(৩) চেঙ পুরা চেঙ শিং

ফৌ পূরা ফৌ শিং।

অর্থ-চাউল ধার করলে চাউলই ফেরত দিতে হবে, আর ধান নিলে ধান।

বাংলা প্রবাদ- ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(৪) কলিদা খূদৈ কংদবনি।

অর্থ-কলিকালে গামছা শুকাবার সময় মেলে না। অর্থাৎ খারাপ কিছু করলে তার প্রতিফল হাতে হাতেই পেতে হয়।

বাংলা প্রবাদ- পাপ বাপকেও ছাড়ে না।

(৫) খূবাক নাম্মতা খূবা মখোল থোক্কে।

অর্থ- এক হাত দিয়ে তালি বাজালে শব্দ হয় না।

বাংলা প্রবাদ- এক হাতে তালি বাজে না।

(৬) য়েংববু হৈরবদি কুম্মৈগী কুম্মৈ ঙাক্তনি।

অর্থ- দেখতে জানলে সব কিছুই দর্শনীয় হয়।
বাংলা প্রবাদ- ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।
(৭) অহলগী মথীনা চফূমেল্লি।
অর্থ-বুড়োর ময়লা দিয়ে পতিলের ছিদ্র বন্ধ করা যায়। অর্থাৎ বুড়ো মানুষের কথা কাজে লাগে।
বাংলা প্রবাদ- পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।
(৮) অঙাংদি নিংথাদা খংঙি।
অর্থ-শিশুকে কোলেই চেনা যায়।
বাংলা প্রবাদ-উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।
(৯) খাঙবা কল্লগা ফমেমন ফম্মি।
অর্থ-ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে একসময় পদোন্নতি ঘটে।
বাংলা প্রবাদ-সবুরে মেওয়া ফলে।
(১০) চাগনবা লায়রবা, শুগনবা য়াঙ্গংবা।
অর্থ-বেশী খায় যারা তারা গরীব হয়, আর যারা বেশী কাজ করে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ থাকে।
বাংলা প্রবাদ-অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়।
(১১) ইরম শল চীদেনবা, মীরম শল চীশাংবা।
অর্থ-নিজের গরুর শিং ছোট-অন্যের গরুর শিং বড়ো।
বাংলা প্রবাদ-গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
(১২) ইশানা থাকচবা লাংদা ইশানা থুজবা।
অর্থ-নিজের পাতালো ফাঁদে নিজেই আটক যাওয়া।
বাংলা প্রবাদ-আকাশের দিকে থুথু ফেললে আপনার গায়েই লাগে।
(১৩) ঈশিংদা লৈতুম থাদবা।
অর্থ-পানিতে ঢিল ছোঁড়া।
বাংলা প্রবাদ-অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।
(১৪) ওকচিন্দা পান থাবা শনজিন্দা লৌ লিংবা।
অর্থ-শুকরের মুখের কাছে কচু লাগানো আর গরুর মুখের কাছে ধান রোয়া।
বাংলা প্রবাদ-শেয়ালের কাছে মুরগী বন্ধক।
(১৫) কপ্পগা নোকপগা মচিন মনাওনি।
অর্থ-হাসি আর কান্না ভাইবোন।

বাংলা প্রবাদ-যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রাম শর্মা।
(১৬) কাহা মাঙ খুজাই কায়।
অর্থ-দুই কূল নষ্ট হওয়া।
বাংলা প্রবাদ-জাত ও গেল পেটও ভরল না।

গ) ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক ঃ
(১) হুইবু দোলাই তোংহল্লগা থিগংদা চোংথৈ।
অর্থ-কুকুরকে পালকীতে চড়ালে আবর্জনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।
বাংলা প্রবাদ-কুকুরের পেটে ঘি সয় না।
(২) হুইনা নুমিৎকীদমক ওয়াই।
অর্থ-সূর্যের জন্যে চিন্তায় মরে কুকুর।
বাংলা প্রবাদ- আদার বেপারীর জাহাজের খবর।
(৩) কোরফু য়োল্লগা তুম্পা লেপ্পা।
অর্থ-মূল্যবান জিনিষ ফেলে দিয়ে মূল্যহীন জিনিষ সঞ্চয় করা।
বাংলা প্রবাদ- সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।
(৪) হাও অতেনবনা টা অশাংবা পায়বা।
অর্থ-বেঁটে মানুষের হাতে লম্বা বর্শা।
বাংলা প্রবাদ- যার কাজ তার সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।
(৫) খোংগ্রাই শথলিঙৈ শন্না ওয়াই।
অর্থ- আয়োজন করতে করতেই ষাড়ের গুতো খাওয়া।
বাংলা প্রবাদ-বজ্ঞারম্ভে লঘুক্রিয়া।
(৬) লু কোকপদা লেন তাবা।
অর্থ-ন্যাড়া মাথায় 'শিল' পড়া।
বাংলা প্রবাদ - যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।
(৭) অতোঙবদা লৈথোনবা অকুৎপদা লৈ তৌবা।
অর্থ-উঁচু জায়গায় মাটি ভরাট করা আর নিচু জায়গায় মাটি খোঁড়া।
বাংলা প্রবাদ-তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
(৮) হৌদোং লৈত্রবদি উচি মখে লাংই।
অর্থ-বিড়াল যখন থাকে না তখন ইঁদুরের লাফালাফি বেড়ে যায়।

বাংলা প্রবাদ- আপন ঘরে কুকুর রাজা।

(৯) চেঙপোৎত্তা মায়রেন তোপ্পা।

অর্থ-চাউলের ভারের উপর লাউয়ের বোঝা।

বাংলা প্রবাদ-বোঝার উপর শাকের আঁটি।

(১০) অঙাং পোক্ত্রিঙৈনা নাহোং শাবা।

অর্থ-সন্তান হওয়ার আগেই দোলনার কাপড় বানানো।

বাংলা প্রবাদ-ঘর নাই তার পূবমুখী দুয়ার।

(১১) কৈ কিদুনা চেল্লগা শওম ওক্লবা।

অর্থ-বাঘের ভয়ে পালাতে গিয়ে ভালুকের কবলে পড়া।

বাংলা প্রবাদ-তপ্তকড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে।

(১২) চাসি মরু হুন্দোকসি মতোং।

অর্থ-ভাল অংশটুকু ফেলে খারাপটুকু খাওয়া।

বাংলা প্রবাদ- কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কেনা।

(১৩) কাংখুলদা মপান শাবা।

অর্থ-চাররাগাছেই ফুল ফোটা।

বাংলা প্রবাদ- ইচঁড়ে পাকা।

(১৪) অপাৎপদা হয়িং থাজনবা।

অর্থ- ঘা'য়ের উপর মাছি বসানো।

বাংলা প্রবাদ- খাল কেটে কুমীর আনা।

(১৫) অপংবগী মরল অশিংবনা চায়।

অর্থ- বোকার সম্পদ ভোগ করে চালাকে।

বাংলা প্রবাদ- বুদ্ধির্যস্য বরং তস্য।

(১৬) ইকাই খঙদবনা পৃকথনবা।

অর্থ- যার লজ্জা শরম নাই, তারই পেট ভরে।

বাংলা প্রবাদ- লাজ মান ভয়-তিন থাকতে নয়।

(১৭) উলৈতবা লমদা কেগেনা যুম্বী ওয়।

অর্থ- যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেই দেশে এরেন্ডা দিয়ে ঘরের খুটি বানায়।

বাংলা প্রবাদ- নাই দেশে এরন্ডা বৃক্ষ।

(১৮) কৈসু কিবা মথীসু কিবা

অর্থ- বাঘেরও ভয়, বাঘের মলেও ভয়।

বাংলা প্রবাদ- গাছেরটা খাবে তলেরটাও কুড়াবে।

মণিপুরী লোকসংগীত ঃ

মণিপুরী লোক সঙ্গীতের ভান্ডার খুবই বৈচিত্রপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ। মণিপুরী লোকসংগীতগুলো মূলতঃ মেলোডি ধারার এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের রসধারায় পূর্ণ। প্রধান প্রধান লোকসংগীতের ধারায় আছে খুনুং ঈশৈ, খুলংঈশৈ, পেনা, খোংজোম, নাইথেম ঈশৈ, নাউশুম ঈশৈ প্রভৃতি।

খুনুং ঈশৈ- স্মরনাতীত কাল থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় লোকমুখে গীত হয়ে আসা সংগীতের যে ধারা তারই নাম 'খুনুং ঈশৈ'। খুন বা গ্রামের গভীরে বা প্রত্যন্ত গ্রামে এসব সংগীতের জন্ম ও সমৃদ্ধি বলেই এ ধারার সংগীতের নাম 'খুনুং ঈশৈ'। এসব গানের গীতিকার বা রচয়িতার কোন সন্ধান কেউ জানে না বা এর গায়ক গায়িকারাও গায়ন পদ্ধতিতে কোন প্রথাগত নিয়ম মেনে চলেন না। বরং তারা অন্তর্গত আনন্দে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেশন করে থাকেন 'খুনুং ঈশৈ'। এসব গানের প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি এবং প্রেম। শহুরে সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতির এ যুগে এ জাতীয় সংগীতের ধারা ক্রমশ ঃ ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। তবু এখনও গ্রামে গ্রামান্তরে গেলে এসব সংগীতের কিছু কিছু অবশিষ্ট রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কালিক বিবর্তনের ধারায় এ জাতীয় লোক সংগীতের বাণী ও সুরের অনেক লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু তবু এগুলোর মৌল আবেদন ও বক্তব্য প্রায় অবিকৃতই রয়ে গেছে। মণিপুরী সমাজে আজও প্রচলিত এরকম একটি লোকসংগীত নীচে উদ্ধৃত হলো।

চীংদা শাৎপা ইঙেল্লৈ
চিন্নদনা কেনখিবা
কল্লকই দে।
ঐনা কেনগে কেনদেদা
মালংবনা হুম্বগী
কেনবনি দে।
মালংবা ঐসু কৈদৌদে
লৈরাংনা লৈখোক লোইবী
কেনবনি দে।

বাংলা অনুবাদ-

পাহাড়ী ফুল ইঙেল্লৈ
অজান্তেই ঝরে গেলে
হায় আফসোস।
ইচ্ছে করেতো ঝরিনি আমি ঝড়ো হাওয়া যে আমাকে
ঝরিয়ে দিয়েছে।
বাতাস আমারই বা কি দোষ
ফুলের জীবন যে শেষ হয়েছে
তাইতো ঝরে গেছে।

খুল্লং ঈশৈ-মনিপুরী সমাজে পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও কায়িক শ্রমে অংশ নিয়ে থাকে। পুরুষরা মাঠে হাল চাষ করে-মেয়েরা করে শস্যবপন। আবার ধান যখন পেকে ওঠে তখন পুরুষদের পাশাপাশি মেয়েরাও মেতে ওঠে ধান কাটার উৎসবে। সাধারণতঃ যুবকেরা যুবতীদের প্রতি বা যুবতীরা যুবকদেরকে উদ্দেশ্য করে পরিবেশন করে থাকে এক ধরনের লোক সংগীত। অপর দলও তার প্রতি উত্তর দেয় সংগীতের সুরেই। বলা বাহুল্য এসব সংগীতের মূল উপজীব্য হলো প্রেম। এ সংগীত ধারার নামই 'খুল্লং ঈশৈ'। খুল্লং মানে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করা আর এভাবে দলবদ্ধভাবে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ঈশৈ বা সংগীত পরিবেশনই হলো 'ঈশৈ'। খুল্লং ঈশৈ এর একটি নমুনা নীচে দেওয়া হলো-

নিপা- নুরা ইবেম্মা নুংশিবা
(পুরুষ) ----------------
শিঙেল লক্তগী অথোইবী
লৈরাং লক্তগী শকহেনবী।
চিনিচম্প্রা কৌবী শীঙেন্না
লৈরাং মদোম শাৎনা
কোচি থাংনা শাৎপগুম
থোকলরে নবুং ঐঙোন্দা
কোলোয় নপাও শোংলম্মো ॥

নুপী- শাবী ইবুংঙো নুংশিবা
(নারী) থংলেন ইমানগী মচা হায়সি
হায়ঙমদা
লেমলৈ ঙানা ওয়া ঙাঙবা লাইজ
ঈশিংনা পনবগুম
কেতুকী কৌবী লৈরাংনা
তিংখং নাওমলক্তা শাৎপগুম
ওয়ানা খাঙজরিবা ননাওনি ॥

এখানে একজন প্রেমিক হৃদয় তার প্রেমিকাকে ফুলের সাথে তুলনা করে তাকে পাবার চিরায়ত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করছে প্রত্যুত্তরে প্রেমিকাও পানির গভীরে থাকা মাছের মতো হৃদয়ের কথা প্রকাশে অপারগ বলে তার অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করছে।

পেনা ঈশৈ-পেনা একধরনের তার যন্ত্র। নারকেলের মালা এবং কাঠ দিয়ে তৈরী এবং ছড়

দিয়ে বাজানো এ বাদ্যযন্ত্র খুবই প্রাচীন। ছড়ের উপর লাগানো থাকে ঘুঙুর যা তালবাদ্যেরও কাজ করে। পেনা যন্ত্রটি ভারতীয় বীণাযন্ত্রের মণিপুরী সংস্করণ এবং পেনা শব্দটিও সংস্কৃত বীনা শব্দ থেকেই উদ্ভুত বলে অনেকে ধারনা করে থাকেন। সাধারণত লাই হারাওবা নৃত্যের সময় মাইবা মাইবীর নাচের সাথে পেনা বাজানো হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন লোকসংগীতের সাথে লোক কাহিনীর গীতিময় বর্ণনায় বা খাম্বা থোইবী গানের সাথেও পেনা বাদন হয়ে থাকে। পেনার সাথে সাধারণতঃ করুণ রসের গানই পরিবেশিত হয়ে থাকে।

খোংজোম ঈশৈঃ মণিপুরী লোক সংগীতের ধারায় সম্ভবত ঃ সর্বশেষ সংযোজন খোংজোম ঈশৈ। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মণিপুর ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত এক অসম যুদ্ধে মণিপুরী বাহিনী পরাজিত হলে মণিপুর বৃটিশ শাসনাধীনে চলে যায়। ঐ সময়ের ভয়াবহতম যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল রাজধানী ইমফাল থেকে ৩২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে থৌবাল এর কাছে খোংজোম নদীর তীরে। মণপুরী বাহিনী প্রবল পরাক্রমে প্রতিরোধ করে শক্র বাহিনীকে এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে দেশ মাতৃকার পবিত্র বেদীতে আত্মোৎসর্গ করে। খোংজোম তীর হয়ে ওঠে মণিপুরীদের প্রাণের তীর্থক্ষেত্র। সেদিনের সেই শহীদদের দেশপ্রেম আর বীরত্ব গাঁথা নিয়ে লোক কবিরা রচনা করেন দেশ প্রেম ও শৌর্য্য বীর্য্যের এক কাব্যগাঁথা যা চারন গায়কেরা ঢোল সহযোগে গেয়ে থাকে। খোংজোম যুদ্ধ নিয়ে রচিত এবং গীত এই সংগীত ধারাই খোংজোম গান নামে পরিচিত হয়ে উঠে। পরবর্তীতে এই গায়ন পদ্ধতিতেই খোংজোম যুদ্ধের কাহিনী ছাড়াও খাম্বা থোইবীর কাহিনী থাম্বালনুর প্রেম কাহিনী বা এমনি অনেক লোক কাহিনী স্থান করে নেয়। এ ধারার গান মণিপুরী সমাজে এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

এগুলো ছাড়াও মণিপুরী লোক সংগীতের ভুবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে 'নাউথেম ঈশৈ' বা শিশুতোষ ছড়া এবং 'নাউশুম ঈশৈ' বা ঘুমপাড়ানি গান।

নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত করা চলে-

১। হো ইমা, ইমা -ও .....

ঐসু লাক্কে ইমাও।

নোং চুই লাক্কনু

য়েস্পাক তুপ্তা মরাক্কে

লম্বী নাল্লি লাক্কনু।

চয়শু শুদুনা মরাক্কে। [শিশুতোষ ছড়া]

এখানে সন্তান ও মায়ের কথোপকথনের আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক চির পরিচিত চিত্র। বর্ষণ মুখর দীনে মা বেরোচ্ছেন কাজে। শিশু সন্তানও মা-র সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। সন্তান বলছে মা মা আমিও তোমার সাথে আসবো। মা বলছেন বৃষ্টি পড়ছে এসোনা। সন্তানের জবাব-ছাতা মাথায় আসবো, পথ পিচ্ছিল এসেনা মা-র

প্রতিউত্তর। কিন্তু নাছোড় বান্দা সন্তান তবু বলছে-লাঠি ভর দিয়ে আসবো মা।

২। থা থা থাবুংতোন
নচা মোরাম্বী পোবিগে
পোবী শনম নম্বীগে
থৈবোং অমতং থাদরকউ। [ঘুমপাড়ানি গান]

এটি অনেকটা আয় আয় চাঁদ মামা'র মতো। শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে মা বলছেন চাঁদ চাঁদ হে পূর্ণ চাঁদ তোমার সন্তানকে আমি কোলে পিঠে বড় করবো আমার জন্যে একটি কাঁঠাল ফেলে দাও।

মণিপুরী লোক সংস্কৃতির ভান্ডার বিচিত্র ও বহুবর্ণিল। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বা প্রকৃতির অপরিচর্চিত কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকসংস্কৃতির এসব উপাদান যেন খনির অন্ধকার অতলে পড়ে থাকা অপরিশীলিত আকর সোনা। এ গুলোকে যদি আধুনিক মানস এবং প্রজ্ঞার আলোকে, কিন্তু তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কে প্রায় অক্ষুণ্ন রেখেই পরিশীলিত করে তোলা যায় তাহলে এই অপরিশীলিত আকর সোনাই হবে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গে দীপ্যমান অত্যুজ্জ্বল শোভন স্বর্ণালংকার।

এ.কে. শেরাম

বাংলাদেশের মণিপুরী ভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন, তিনি হলেন প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কবি এ.কে. শেরাম। তিনি 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' গঠন করে বাংলাদেশে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এ সংগঠনটি গঠনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নয় সেই সাথে বাংলাদেশে মণিপুরী সংস্কৃতি চর্চায়ও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এ.কে. শেরাম মণিপুরী ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও সমান দক্ষতায় লিখে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর একটি মণিপুরী ভাষায় কাব্য গ্রন্থ 'বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং', একটি বাংলা কাব্য গ্রন্থ 'চৈতন্যে অধিবাস এবং দু'টি গবেষনা ধর্মী প্রবন্ধ সংকলন 'মণিদীপ্ত মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক-ইতিহাসের দর্পনে দেখা' ও 'বাংলাদেশের মণিপুরী ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেনী সঙ্গমে' প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের মণিপুরী কবিতা' এবং 'মণিপুরী লিপি পরিচিতি' নামক দু'টি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের অনিয়মিত সাহিত্য সাময়িকি 'মৈরা'র (প্রথমে 'দ্বীপান্বিতা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল) সম্পাদক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

মণিপুরী নৃত্য, বাঙালি সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তামান্না রহমান

১৯১৯ সাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের এক পর্যায়ে সিলেট জেলার মণিপুরী অধ্যুষিত 'মাছিমপুর' গ্রামে সর্বপ্রথম মণিপুরী নৃত্য প্রত্যক্ষ করলেন। বাঙালি সংস্কৃতির খুব কাছের এই নাচটি প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, চিনতে পেরেছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী ভিত্তিক মণিপুরী রান নৃত্যের গভীর শিল্প সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে বিশ্বকবি অচিরে শান্তিনিকেতনে এই নৃত্য শিখার ব্যবস্থা করেন। মণিপুরী সম্প্রদায়ের বাইরে বিশ্ববাসীর সামনে মণিপুরী নৃত্য ক্রমশ পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেলো। সেই সাথে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো মণিপুরী ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির এক অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের কথা।

মণিপুরী নৃত্য এখন ভারত উপমহাদেশের প্রধানতম শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলির (Classical) অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত। এর অনন্য শৈল্পিক গুণে বিশ্ব নৃত্যের জগতেও সুপ্রতিষ্ঠিত। আর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে মণিপুরী নৃত্যের চর্চা হয়ে আসছে দু'শ বছরের অধিক সময় ধরে।

মণিপুরী নৃত্যের উৎপত্তি বর্তমান ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র রাজ্য 'মণিপুর'এ। চারিদিক পর্বতমালা বেষ্টিত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬০০ ফুট উপরে অবস্থিত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর মণিপুর একটি মালভূমি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে মণিপুরী জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির তিব্বত ব্রহ্ম শাখার কুকি-চীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খণ্ডিতভাবে প্রাপ্ত সূত্র থেকে জানা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এখানে একজন রাজা ছিলেন। এর দীর্ঘদিন পরে ৩৩ খ্রীস্টাব্দে রাজা 'পাখংবা'র রাজত্বকালে 'চৈথারোল কুম্বাবা' নামে রাজকীয় ঘটনাপঞ্জী লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি চালু হয় যা মণিপুরীদের অতীত ইতিহাস জানার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে বিবেচ্য। আজও মণিপুরে এই প্রথা প্রচলিত।

অন্তত: আড়াই হাজার বছরের প্রাচীণ এই জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসও প্রাচীণ ও বর্ণাঢ্য। প্রাচীণ কালের পুরানাদি থেকে যতটুকু জানা যায় নৃত্য, গীত ও বাদ্য সবসময়ই মণিপুরীদের জীবন আচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে চলে এসেছে। ধর্ম ও সংস্কৃতি এখানে পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে আসছে। প্রাচীণকালে মণিপুরীরা বিভিন্ন লৌকিক দেব দেবী যেমন 'সনামহী' (গৃহদেবতা), 'পাখংবা' (চন্দ্রদেবতা), 'উমংগলাই' (বনদেবতা) এদের পূজা করতেন। সেই সময়ের প্রধান উৎসব ছিল 'লাই-হারাওবা', লাই শব্দের অর্থ দেবতা ও হারাওবা শব্দের অর্থ আনন্দদায়ক। এই উৎসবের উদ্দেশ্যে ছিল দেবতাকে প্রসন্ন করা। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে মণিপুরের প্রান্তে প্রান্তে সাত থেকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত ধর্মীয় আচারভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান ও নৃত্য ও এই উৎসবে হয়। দেবতার আবাহন থেকে শুরু করে পৃথিবীর সৃষ্টি তত্ত্বের নানা পর্যায়গুলি সূক্ষ্ম ও জটিল নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে মাইবী বা মহিলা

পুরোহিতরা পরিবেশন করেন। 'লাই-হারাওবা' উৎসবে অনুষ্ঠিত নৃত্যকেই মণিপুরী নৃত্যের আদিরূপ বলে মানা হয়।

'লাই-হারাওবা'তে মাইবী নৃত্যের পাশাপাশি লোক উপাখ্যান ভিত্তিক নৃত্যগুলিও অপরিহার্য্য। মণিপুরীরা প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথাগুলির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং এগুলি থেকে তারা নৃত্য ও সঙ্গীতের নানা উপকরণও সংগ্রহ করেছে। যেমন 'নিংথৌ এবং পাস্থৈবী'র প্রাচীণ কাহিনীভিত্তিক নৃত্যনাট্য এবং পরবর্তীকালে 'খম্বা-থৈবী'র ইতিহাসাশ্রয়ী লোককাহিনীভিত্তিক লোকনৃত্য। মণিপুরীরা দলগতভাবে এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া দোল পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত 'থাবল চোংবী' এবং মার্শাল আর্ট ভিত্তিক তলোয়ার ও বর্শা নিয়ে নৃত্য 'থাঙ-তা জগোই'ও মণিপুরীদের লোকনৃত্যের ভান্ডারে সমৃদ্ধ শিল্প।

মণিপুরীরা সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের প্রাচীণ ধর্ম বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে লালন করে এসেছে। ধারণা করা হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে মণিপুরীরা আর্য সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মের আওতায় এসে পড়ে। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে ও কোন কোন ঐতিহাসিকের মতানুসারে খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে অগ্নিদেবের পূজা, ইন্দ্রদেবের পূজা, দূর্গাপূজা'র নানা প্রমাণ পাওয়া গেলেও অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মণিপুরে হিন্দুধর্ম পালনের আর কোন প্রমাণ মেলে না। তবে এ সময়কালে তাদের প্রাচীণ ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে পূর্ণভাবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা কিয়াম্বার শাসনকালে মণিপুরে বাঙলার বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা ঘটে। এ সময়ে একটি বিষ্ণু মন্দির স্থাপিত হয় এবং স্মভবত সেখানে বঙ্গ থেকে আগত কীর্ত্তনগায়করা গান গাইতেন। এরপর রাজা খাগেম্বার শাসনকালে (১৬৩০ খৃ:) কীর্ত্তন গায়কদলের উল্লেখ পাওয়া যায় যা 'বঙ্গদেশে পালা' হিসেবে পরিচিতি পায়। এভাবে বাঙলার একান্ত নিজস্ব কীর্ত্তন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সাথে সাথে মণিপুরে প্রবেশ করে ও সেখানে বাঙলার সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়।

এদিকে চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের মাধ্যমে সারা বঙ্গে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে যায়। জাত পাতের কুসংস্কারের আচ্ছন্ন, শাস্ত্রের কঠোর বিধানে আবদ্ধ হিন্দুধর্মে নবীণ জীবন সঞ্চার করেছিলেন চৈতন্যদেব। প্রেম ও সাম্যের বাণী প্রচারের মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মকে সত্যিকারের জনপ্রিয়তা দান করেন ও সারা ভারতবর্ষে তা ছড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রের শক্তবাক্য আর মন্ত্রোচ্চারণ নয়, শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের নামকীর্তনকেই তাঁর ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। সংস্কৃতি ভাষার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের ভাষা বাঙলাতে ধর্ম প্রচার ও পালন শুরু করেন। জীবে দয়া ও প্রেমভক্তি ছিল তার প্রধানমন্ত্র। ক্রমে কীর্তন সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের এক ভক্তিময় পরিবেশনা হয়ে উঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম অনুষ্ঠানে।

মণিপুরে মহারাজ হিসেবে খ্যাত রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের (১৭৬৩-১৭৯৮) শাসনকালে বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় মণিপুরে আদৃত ও প্রচলিত হয়। স্বয়ং মহারাজ

এই ধর্মে দীক্ষা নেন ও রাজধর্মরূপে এই ধর্মকে ঘোষণা করেন। প্রজারাও এই ধর্মে দীক্ষা নেয়। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানগুলি পালনের জন্য ইতিমধ্যে মণিপুরে প্রবেশকারী বাঙলা কীর্তন ভিত্তিক নৃত্য ও বাদ্য মণিপুরীরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন। মহারাজা মণিপুরের প্রচলিত হরফের পরিবর্তে বাঙলা হরফের প্রচলন করলেন। ক্রমে বাঙলার বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীগুলি মণিপুরীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্য মণিপুরে সমাদৃত হলো।

মণিপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মণিপুরীদের সংস্কৃতি ও জীবনধারায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। আপাতভাবে ভিন্ন দু'টি সংস্কৃতির সিনথেসিস বা মেলবন্ধন ঘটলো যা সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। মণিপুরীদের প্রাচীণ সংস্কৃতি ও বাঙলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হলো যার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ঘটলো এর নৃত্যকলায়। রাজনীতি, ধর্ম ও সমাজজীবনের পরিবর্তন সম্পূর্ণ প্রভাবিত করে মণিপুরীদের নৃত্যকে। 'নটসংকীর্তন' ও 'রাস' নামে ভক্তি রসাশ্রয়ী দু'টি অত্যন্ত পরিশীলিত ও পরিমার্জিত ধর্মীয় নৃত্যাচার প্রধান অনুষ্ঠান মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের শাসনকালে প্রচলিত হলো। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে শুধু যে সংকীর্তন ও রাস এর প্রবর্তন হলো, তা নয়। সমগ্র নৃত্যধারা এমনকি মণিপুরের সমাজজীবনে নৃত্যের ভূমিকার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলো। ব্যাপক পরিবর্তন এলো নৃত্যের ব্যকরণে, নৃত্যানুষঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে এবং সঙ্গীতে। এইভাবে, বাংলার কীর্তনভিত্তিক নৃত্যগীত ও মণিপুরীদের পূর্বে উল্লেখিত প্রাচীণ নৃত্যধারার সমন্বয়ে, সঙ্গীত ও নৃত্যবিষয়ক বৈষ্ণব শাস্ত্রকে ভিত্তি করে যে নতুন আঙ্গিকের নৃত্যশৈলীর উদ্ভব হলো-সেটাই পরবর্তীতে শাস্ত্রীয় মণিপুরী নৃত্য হিসেবে স্বীকৃতি পেলো। বৈষ্ণব সাহিত্য এই নৃত্যের আত্মা স্বরূপ। মণিপুরী নৃত্যের তাল অনুসঙ্গের জন্য বাঙলার মাটির খোল এর অনুসরণে নির্মিত হরো কাঠের 'পুং' বা মণিপুরী মৃদঙ্গ। মণিপুরীদের নিজস্ব গায়নশৈলীতে বাঙলার কীর্তন পেলো এক বিশিষ্টতা যেখানে স্বরসমূহের কম্পন শ্রুতিতে আনে বিশেষ মাত্রা। এভাবে মণিপুরী শাসকশ্রেণীর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুরা তাদের সৃজনশীলতা প্রয়োগে এক অনুপম সংস্কৃতি সৃষ্টি করলেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ও সাম্যের ধর্ম মণিপুরী সূক্ষ্ম শিল্পরস ও বোধের ছোঁয়ায় ভক্তিমার্গের দু'টি প্রধান রূপে পরিস্ফুট হলো-'সংকীর্তন' ও 'রাস' এ। এছাড়াও বৈষ্ণব ধর্ম প্রভাবে মণিপুরীরা আরও নানাবিধ সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ধারায় বিকাশ লাভ করতে থাকে। 'বাসক ফাঙনবা' তে নায়িকাভেদের অভিনয় নৃত্য, রথযাত্রায় ভুক ঈ শৈ (করতালি নৃত্য), হোলি উৎসবের ঢোল, রামতাল, ডম্ফ সহযোগে নৃত্য প্রতিটি যুথবদ্ধ শিল্প সুষমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তবে একটি বিষয় এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, মণিপুরী জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হলেও তাদের অতীত সংস্কৃতিকে কখনোই পরিত্যাগ করেনি। প্রাচীণ উৎসব ও নৃত্যগুলি আজও তারা সমমর্যাদা ও উৎসাহের সঙ্গে পালন করে আসছে।

অপরদিকে বাঙলায় বাঙালিরা কালের পরিক্রমায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে

সরে যেতে থাকে ও ক্রমশ: অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়। বৈষ্ণব সংস্কৃতির সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তথাপিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ও সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ, নজরুলসহ অন্যান্য কালজয়ী বাঙালি কবিদের জন্য চির অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী 'রাস' এর আধারে অপূর্ব সুন্দর নৃত্যনাট্য রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষাদান শুরুর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে পুনরায় নৃত্যে আগ্রহী করে তুলতে থাকেন। আজকে বাংলাদেশে তথা সারা বিশ্বে মণিপুরী নৃত্যের ব্যাপক চর্চা ও জনপ্রিয়তার জন্য তাই যুগপথ মণিপুরী ও বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট মণিপুরী নৃত্য শিল্পী এবং গবেষক

মণিপুরী লোক সাহিত্য ঃ ফুঙ্গাঁ বারী

- এ দিলীপ মীতৈ

কোন এলাকার বা কোন জাতির লোক সাহিত্য ঐ এলাকার বা জাতির সংস্কৃতির সাথে অতোপ্রতো ভাবে জড়িত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোক সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর "বাংলার লোক সাহিত্য" গ্রন্থে বলেন "লোক সাহিত্য কাহাকে বলে? এই বিষয়ে কেবল মাত্র আমাদের দেশে কেন, পাশ্চাত্য সমালোচক দিগের মধ্যেও যে একটি সুষ্পষ্ট ধারনা প্রচলিত আছে পাশ্চাত্য সকল সমালোচকই প্রায় একমত হইয়া থাকেন যে, ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নহে।"

লোক সাহিত্যের উপাদানগুলো কোন পন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক একক প্রদত্ত নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন এগুলো প্রদান করেছেন। তবে এ কথা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি যে, কখন থেকে এবং কে প্রথম এগুলো রচনা করেন।

লোক সাহিত্য, লোক-কথা বা ফুঙ্গা ব্বারী ঃ

লোক সাহিত্য বা লোক-কথা কে মণিপুরী ভাষায় ফুঙ্গাঁ ব্বারী বলা হয়। আগেকার দিনে বিশেষ করে শীতের রাতে বাবা-মা, নানা-নানী বা দাদা-দাদীরা তাদের সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনীদের নিয়ে ফুঙ্গাঁ [তাপ পোহানোর উনুন]- এর চার পাশে গোল করে বসিয়ে বংশ পরম্পরায় শুনে আসা বা বলে আসা গল্পগুলো বেশ মজা করে বলে শোনাতেন। সে থেকে এ গল্পগুলো ফুঙ্গাঁ ব্বারী হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এ ক্ষেত্রে 'ফুঙ্গাঁ' অর্থে তাপ পোহানোর জন্য ব্যবহৃত বিশেষ উনুন। 'ব্বারী' অর্থে গল্প। কারো কারো কাছে এ গল্পগুলো 'চাকঙাই বারী' নামেও পরিচিত। এ ক্ষেত্রে দিনের কাজ-কর্ম শেষে রাত্রিবেলা মা যখন রান্না করতে যান তখন বাড়ীর গুরুজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সবাইকে একত্রে সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাত্রের খাবারের অপেক্ষা করতে করতে এ গল্পগুলো করে থাকনে বলে এটির এরূপ নামকরণ হয়েছে। 'চাকঙাই' অর্থ ভাতের অপেক্ষা করা।

গল্প বলা ও শোনার রীতি সুদুর অতীত থেকে চলে আসছে। সভ্য-অসভ্য নগর অথবা সাধারণ জনপদ সবক্ষেত্রেই লোকে গল্প বলার পাশাপাশি গল্প শোনেও থাকে। আধুনিক সভ্যতার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসেও কি কেউ গল্প শোনেন না? শোনেন। তবে যুগের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে গল্পগুলোর বিষয়বস্তু কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। শহরে জীবনে যদিও এর প্রভাব কমার পথে তথাপি গ্রামাঞ্চলে আজও সাধারণ চাষী ও অন্যান্য সম্প্রদায় বংশানুক্রমে চলে আসা বা শুনে আসা গল্প, কিস্‌সা-কাহিনী বলে ও শোনে থাকে।

ফুঙ্গাঁ ব্বারী বা লোক-কথার সুনির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই, ও ভোগেশ্বর সিংহ তার লোক সাহিত্য ফুঙ্গাঁ ব্বারী, পাম্থৈ পাউরৌ প্রবন্ধে ফুঙ্গাঁ ব্বারীকে প্রধানত : চারটি ভাগে ভাগ করেন। যথা-

(১) বোকা ও চালাক ঃ নিঙোল মরা অপংবগী ব্বারী (বোকা স্বামীর গল্প), অপঙ মচিল

মনাওগী ৱারী (বোকা ভাই বোনের গল্প), নিংথৌ মচা মন্ত্রী মচাগী ৱারী (রাজা ও মন্ত্রীর সন্তানের গল্প), লুখ্রাবী মচা চন্দ্রকংনানগী ৱারী (বিধবার সন্তান চন্দ্রকংনার গল্প), নাপংবা ইমুং মনুংগী ৱারী (কানে শোনতে না পাওয়া পরিবারের গল্প) ইত্যাদি।

(২) রূপ কথা ম্যাজিক রোমাঞ্চ ঃ পৌরানিক্কী নাওং ওইনা তৌবা লাই তিনগী ৱারী (পৌরানিক দেব-দেবীর কাহিনী), ইতিহাস কুম্বগী ৱারী (ইতিহাস সম্বন্ধীয় গল্প বা কাহিনী) ইত্যাদি।

(৩) চক্রান্ত-রূপান্তর ঃ তাইবং মীনা কৈশা-কৈ, উচেক-বায়া, হঙোইনচিংবা ওনখিবগী ৱারী (পৃথিবীর মানুষের জন্তু-বাঘ, পশু-পাখী, ব্যাঙ প্রভৃতিতে রূপান্তরের গল্প), মমা পোক্তবীগী চক্রিদগী পোক্তবী মচানুপীনা মথ্ৱাই শোকমনখিবনা উচেক, লাংমৈদোং ওনখিবা অমদি হারি নিংনাং ওনখিবগী বারীশিং (বিমাতার লাঞ্ছনায় মাতৃ হীন বালিকার পাখী ও পতঙ্গ হয়ে যাওয়া গল্প) ইত্যাদি।

(৪) প্রেম কাহিনী ঃ ট্র্যাজেডি অমদি কোমেডিগী মওংদা লোইশিল্লকপা নায়ক নায়িকাগী চরিত্র তাকপা ৱারী শিং (ট্র্যাজেডি ও কমেডি সম্বলিত নায়ক নায়িকার চরিত্র উপস্থাপিত গল্পগুলো)।

এগুলো ছাড়াও বেশ কিছু প্রবাদ সম্বলিত গল্প রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে পেনা শেন্নিঙৈ শ্যামুরৌ যৌবা, লৈমা য়েংলিঙৈ খুনু কাবা, লুখ্রাবী শামু লোইবী, য়েত্তুম পোৎনা লেংথোং নাবা ইত্যাদি।

এভাবে ফুঙ্গাঁ ৱারী গুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগকরা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে কবুই কৈওনবা (অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক বাঘ) গল্পটি সঙক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বাংলায় অনুবাদ করা হল ঃ

একদিন কবুই কৈওনবা (অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক বাঘ) খাবারের সন্ধানে বেরুলে একটি গ্রামে এসে হাজির হয়। সেখানে দরজায় শব্দ হচ্ছে শুনে এক বিধবা ঘরের ভিতর থেকেই জিজ্ঞেস করল, কে?

বাইরে থেকে জবাব এলো "আমি"।

এবার মহিলা কণ্ঠস্বরটি কার তা জানার চেষ্টা করলো, সে কিছুতেই কণ্ঠ স্বরটি পরিচিত বলে মনে হলো না। তাই স্বচক্ষে দেখার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। যেই দরজাটা খুলল দেখে কবুই কৈওনবা তার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে। কবুই কৈওনবার মুখটি যেই দেখল এমনি বিধবা ভয়ে কাঠ হয়ে তার সামনে দাড়িয়ে রইল, দরজা বন্ধ করবে কিনা তাও বুঝে উঠতে পারল না। এবারে কবুই কৈওনবা বিধবাকে দেখতে পেয়ে মনের খুশীতে বলে উঠল, "আমি মানুষের মাংস খুবই পছন্দ করি। কিন্তু কোথাও পাইনি। আমি তোমাকে খাবো বলে এখানে এসেছি।"

কবুই কৈওনবার কথাগুলো শুনতেই বিধবা জ্ঞান ফিরে পায় এবং বেশ সাহস সঞ্চয় করে বলল "এ তুমি কি বলছ? আমি একজন গরীব বিধবা, কি এমন ভাল খাবার আমি খেতে

পাই আমাকে খেয়ে তুমি কোন স্বাদ পাবে না। তুমি বরঞ্চ থবাতোন এর কছে যাও। থবাতোন এর বাড়ী এখান থেকে বেশ দুরে নয়। সাত ভাইয়ের মধ্যে সেই একমাত্র বোন। তাই সে সবার খুব আদুরে। সে ঘরে বসে ভাল ভাল খাবারই খেয়ে থাকে কোন কাজ করে না এবং সে দেখতে খুবই সুন্দর। তুমি যদি ওকে খাও তবে বেশ স্বাদ পাবে।"

বিধবার কথাগুনে কবুই কৈওনবা মনে মনে ভাবল তাই তো। সে প্রশ্ন করল "তার ভাইগুলো কেমন"?

'তারা সবাই বাইরে গেছে। তুমি থবাতোনের বাড়ীতে গিয়ে তার বড় ভাইয়ের গলা অনুকরণ করে ডাক দিবে। তাতে সে দরজা খুলে দিবে। কোন সংকুচবোধ করবে না' বিধবা পরামর্শ দিল।

বিধবার কথাগুলো তার মনের মতো হওয়াতে সে সেখানে দাড়িয়ে সময় নষ্ট না করে থবাতোনের বাড়ীর দিকে ছুটল। সেখানে পৌছাতেই সে দরজার কড়া নেড়ে ডাক দিল, "থবাতোন! থবাতোন! দরজা খুলো।" থবাতোন বুঝতে পারল এ তার ভাই নয় অন্য কেউ তাই দরজা না খুলে জবাব দিল তুমি আমার বড় ভাই নও, ওর গলার সাথে তোমার গলার কোন মিল নেই। আমি দরজা খুলব না।"

থবাতোন দরজা না খুলাতে কবুই কৈওনবা ভীষণ ভাবে রেগে গেল, সে সাথে সাথে বিধবার বাড়ীতে এলো। এখানে এসে সে বিধবাকে জাগালো এবং বলল, তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমি বোকা নই। থবাতোন কোন দিনই দরজা খুলবে না এখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি তোমাকে খাব।

কবুই কৈওনবার কথাগুলো শুনতেই বিধবার মন চঞ্চল ও ভীত হয়ে উঠল। সে সাথে সাথে বলল, "থামো! থামো! আমি তোমাকে সাহায্য করব।" কবুই কৈওনবা বিধবার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল 'তাহলে চল'। বিধবা ও কবুই কৈওনবা থবাতোনের বাড়ীতে এসে পৌছালে বিধবা থবাতোনের বড় ভাইয়ের গলা অনুকরণ করে ডাক দিল। ডাক শুনে থবাতোন তার ভাইয়েরা ফিরে এসেছে মনে করে খুশীতে দরজা খুলল। সে সুযোগে কবুই কৈওনবা থবাতোনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে পা চালায়। থবাতোন কবুই কৈওনবার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য হাত পা ছুড়তে থাকে এবং প্রাণপন চিৎকার করে। কিন্তু তাকে বাঁচানোর জন্যে কেউ এগিয়ে এলো না।

জঙ্গলে এসে কবুই কৈওনবা থবাতোনকে খাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন থবাতোনের মুখশ্রী দেখে সে তার সিদ্ধান্ত পাল্টে নিল। সে থবাতোনকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার বাসনা জানালো। থবাতোনের গায়ের জোড় কবুই কৈওনবার সাথে পেরে উঠার ক্ষেত্রে নগন্য হওয়াতে সে তার সব ধরনের প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। সে জঙ্গলেই গাছের ডাল পালা দিয়ে একটি কুটির তৈরী করে কবুই কৈওনবার সাথে সংসার পাতলো। থবাতোন না চাইলেও কবুই কৈওনবা অনেক কিছুই এনে দিত। কিন্তু এসবে তার মন ভরতো না। সব সময়ই ভাবতো কি করে কবুই কৈওনবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সাত ভাইয়ের কথা

তো প্রতিটি মূহুর্তেই ভাবতো, একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারতো না। এভাবে সে দুটি সন্তানের মা হয়ে যায়। তার পরও সে কোন কিছুতেই সুখ খুঁজে পায় না। মন তার পড়ে থাকে ভাইদের নিয়ে। সে অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক বাঘের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার জন্য দিন রাত ফন্দী আটতে থাকে। কবুই কৈওনবা একটি মূহুর্তের জন্যও থবাতোনকে চোখের পলকের বাইরে রাখতো না। সব সময় চার পাচরপাশে ঘুর ঘুর করে থাকতো বলে থবাতোন কখনো তেমন সুবিধা করে উঠতে পারতো না। কয়েদী জীবন যাপনের জাল ফুড়ে বের হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না।

অন্যদিকে একদিন থবাতোনের সাত ভাই বাড়ীতে ফিরে। বাড়ীতে তারা তাদের একমাত্র বোনকে খুঁজে না পেয়ে বেশ মর্মাহত হয়ে যায়।

গ্রামে খোঁজ খবর নিয়ে যখন জানতে পারল তাদের বোনকে কবুই-কৈওনবা নিয়ে পালিয়েছে। তখন তারা সবাই প্রতিজ্ঞা করল কবুই-কৈওনবা আমাদের বোনকে নিয়ে গেছে আমরা তাকে একদিন না একদিন খুঁজতে খুজতে একদিন এক জঙ্গলে এসে বেশ দুরে একটি কুটির দেখতে পায় কুটিরটি দেখে তারা মনে করল এবারে অন্তত একটা মানুষ পাওয়া গেল। তারা কুটিরের দিকে কিছুটা এগিয়ে কুটিরকে লক্ষ্য করা যায় এমন দুরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করল। সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুটিরের দিকে। কুটির বাসীটি কে তা না জানাতে তারা দুর থেকে তাকে যদি একবার দেখা যায় ঐ আশায় কুটিরটির চারপাশ লক্ষ্য করছিল। এক সময় তারা কুটির থেকে একটি মহিলাকে বের হতে দেখে। মহিলাটিকে দুর থেকে স্পষ্ট ভাবে দেখতে না পাওয়াতে তারা কুটিরের দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যায়। এবার তারা ঐ মহিলাকে চিনতে পারল, এ তাদের হারিয়ে যাওয়া একমাত্র বোন থবাতোন। তারা খুবই সতর্কতার সাথে থবাতোনের কাছাকছি হয়ে সাপের মতো করে ফিস্ ফিস্ শব্দ তুলে। থবাতোন সাপের শব্দ শুনে যে দিক থেকে শব্দ হচ্ছে সে দিকে তাকালে তার ভাইদের দেখতে পায়। তার ভাইদের দেখে থবাতোন সাথে সাথে এক ফন্দী আঁটে। সে দুদিকে মুখ ওয়ালা একটি বাঁশের চোঙ্গটি নিয়ে কবুই কৈওনবার সামনে এসে হাজির হয়। থবাতোন ঐ বাঁশের চোঙ্গটি কবুই কৈওনবাকে দিয়ে বলল "ঘরে একফুটা পানি নেই, তুমি এটি নিয়ে গিয়ে কিছু পানি নিয়ে এসো"।

থবাতোনের কথা বলা শেষ হতে না হতেই কবুই কৈওনবা তা পালনের জন্য বাঁশের চোঙ্গটি নিয়ে পুকুরের দিকে ছুটে গেল। সে সুযোগে থবাতোন কুটির ছেড়ে ভাইদের সাথে চলে এলো। যথা সম্ভব পা চালিয়ে তারা জঁঙ্গল ত্যাগ করল ও নিজ বাড়ীতে এসে পৌছাল। কবুই কৈওনবা তার কুটিরে এসে যখন থবাতোনকে দেখতে পাবে না তখন সে অবশ্যই থবাতোনকে খুঁজতে বাড়ী পর্যন্ত আসবে তা তারা অনুমান করে নিল। সে হিসেবে তারাও বোনকে পাহারা দিতে থাকে এবং কবুই কৈওনবাকে হত্যা করার ফন্দী আঁটে।

এদিকে কবুই কৈওনবা পুকুরে এসে বাঁশের চোঙ্গটিতে পানি ভরার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন ভাবেই পানি ভরতে পারছে না এক মুখ দিয়ে পানি ভরে তো অন্য মুখ দিয়ে সবটুকু পড়ে

যায়। এমন সময় একটি কাক এসে পুকুর পারে এক গাছের ডালে বসে। সে নীচের দিকে তাকাতেই কবুই-কৈওনবাকে দুমুখ ওয়ালা একটি বাঁশের চোঙ্গে পানি ভরার বৃথা চেষ্টা করতে দেখে। কবুই-কৈওনবার কান্ড দেখে কাক হেসে হেসে বলল, 'ও হে কবুই-কৈওনবা তোমার বাড়ীতে আগুন লেগেছে এবং তোমার স্ত্রী পালিয়ে গেছে"।

কাকের কথা শুনে সে বাঁশের চোঙ্গঁটি ফেলে দিয়ে তাড়াতড়ি করে তার কুটিরে এলো। এসে দেখল তার কুটিরে আগুন লেগেছে। থবাতোন যাওয়ার সময় তার কুটিরে আগুন লাগিয়ে যায়। কুটিরের চার পাশে থবাতোনকে কিছুক্ষণ খুজল তারপর যখন থবাতোনকে পাওয়া গেল না তখন থবাতোনের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। থবাতোনের বাড়ীতে পৌছালে সে কোন ভাবেই বাড়ীর ভিতর ঢুকতে পারল না। তাই সে সুযোগের অপেক্ষায় বাড়ীর আশেপাশে একটি জায়গায় লুকিয়ে পড়ল।

এক সন্ধ্যায় থাবাতোন কাঠ কুড়ানোর জন্যে বাড়ীর বাইরে বের হলে কবুই-কৈওনবাকে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পায়। কবুই-কৈওনবাকে দেখার সাথে সাথে সে ভয়ে দিক শূন্য হয়ে যায় এবং গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠে। থবাতোনের চিৎকার শোনে বাড়ীর ভিতর হতে তার ভাইয়েরা বাইরে বের হয়। কবুই-কৈওনবা তার ভাইদেরকে দেখতে পেয়ে পালাতে শুরু করে। কিন্তু কিছু দুর পালানোর পর থবাতোনের সাত ভাইয়ের হাতে ধরা পড়ে। থবাতোনের ভাইয়েরা সবাই মিলে প্রহার করতে থাকলে এক সময় কবুই-কৈওনবা মারা যায়।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কবুই-কৈওনবার মৃত্যু সংবাদ সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে যায় গ্রামের সবাই থবাতোনের সাত ভাইকে বাহ! বা! দিতে থাকে। সে দিনের পর থেকে সাত ভাইকে নিয়ে থবাতোন সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করে।

এ ফুঙ্গা বারী টিতে কবুই-কৈওনবা ও থবাতোনকে যথাক্রমে মণিপুরীদের রাজা গরিবনেওয়াজ ও মীতৈ ঈনাৎ (মণিপুরী ধর্ম) এর ভুমিকায় রূপদান করা হয়েছে। তাছাড়া মণিপুরীদের সাতটি য়েক-সলাইকে থবাতোনের সাতটি ভাই রূপে গল্পটি সাজানো হয়েছে।

এ দিলীপ মীতৈ

নতুন প্রজন্মের যে কজন তরুণ মণিপুরী গবেষক রয়েছে তাঁদের মধ্যে এ দিলীপ মীতৈ একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা' বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে বর্তমানে 'মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর'-এ সহকারী গবেষক হিসেবে কর্মরত। তিনি মণিপুরীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্যও বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি দু'বছর 'বাংলাদেশ মণিপুরী ছাত্র সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। "অনৌবা খোংথাং" (নব পদযাত্রা) নামক মণিপুরী পত্রিকা সম্পাদনাও করে থাকে। বর্তমানে 'দি মণিপুরী'র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হামোম প্রমোদ

সাহিত্যের সবগুলো শাখার মধ্যে কবিতা প্রাচীনতম। যে কোন সাহিত্যেরই সম্ভবত পথ চলা শুরু হয় কবিতার মাধ্যমে। মণিপুরী সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। কেননা কবিতার জন্ম আদিকাল গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের কর্মান্তিক অবসরে। গরু চরাতে গিয়ে ক্লান্ত রাখালের বাঁশী বাজানো, পড়ন্ত বেলায় লাংগল কাঁধে বিধ্বস্ত কৃষকের সান্ধ্যগীত ফুল ফসলের ভবিষ্যৎ কল্পনা আর তা থেকে যৌথ নৃত্যের আরণ্যক অংগ ভংগিমা এবং সেই সংগে ইঙ্গিতবহ শব্দোচ্চারণের মাত্রাবোধ এই সবের ভেতর দিয়ে কবিতার জন্ম। পন্ডিতজনেরা মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকেন।

(১) প্রাচীন যুগ-দূর অতীত থেকে সপ্তদশ শতাব্দরি শেষ পর্যন্ত।

(২) মধ্যযুগ - অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

(৩) আধুনিক যুগ - বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত।

প্রাচীন যুগ ঃ-

পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের মত মণিপুরী প্রাচীন সাহিত্যও মুখে মুখে গান / গীতির মাধ্যমে চর্চা হতো এবং বাদ্য যন্ত্রের সহযোগে পরিবেশন করা হতো।

মণিপুরী প্রচীন কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এন খেলচন্দ্র বলেন, "As in the early works of other literatures, those of Manipuri too were meant to be sung or recited sometimes to the accompaniment of an instrument called pena. In evaluating them this intrinsic ingredient of music must not be lost sight of. And there is ample evidence that befor long narratives on themes like mythologies love, heroism etc., ritual and prayer songs had preceded them. They were first unwritten as sung by select person's on particular occasions and thus handed down From one generation to another. It is not untill much later that these early songs were written down and they may be said to have ushered in the dawn of early manipuri poetry.

একথা ঠিক, মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের প্রাচীন যুগ সম্পর্কে বিশদ ও পরিপূর্ণ তথ্য এখনো আমরা পুরোপুরি জানতে পারিনি। এ যাবত মাত্র কয়েকটি পান্ডুলিপি পেয়েছি যা খন্ডিত আকারে, কখনো আরম্ভ এবং সমাপ্তি ছাড়া। আর এ গুলিই মণিপুরী প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিংবা প্রতিনিধিত্ব মূলক রচনা কিনা তা আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানবার উপায় নেই। কেননা, ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু রামান্দি ধর্মের প্রচারক গুরু শান্ত দাসের পরামর্শে এবং প্ররোচনায় মণিপুর রাজ গরীব নেওয়াজ মণিপুরী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাচীন ও মূল্যবান

অনেকগুলো গ্রন্থ ভষ্মীভূত করেছিলেন এবং এভাবেই রচিত হয়েছিল মণিপুরীদের ইতিহাসের এক কলংকময় অধ্যায়। এ যাবৎকাল প্রাপ্ত মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো "ঔগ্রী"। গীতি কাব্য ধরনের এই ঔগ্রী খ্রীষ্টিয় ৩৩ অব্দে মণিপুর রাজ 'পাখংবার' রাজ অভিষেকের সময় পাখংবা কর্তৃক সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যে গীত হয়েছিল বলে জানা যায়। বক্তব্য এবং উপযোগীর নিরিখে "ঔগ্রী" কেবল মাত্র বৈদিক স্তোত্রের সাথেই তুলনীয়। মণিপুরী প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের অন্যান্য গুলোর মধ্যে প্রথম শতাব্দীর থেংগৌরোল, নিংথৌরোল তানয়েবা, তৃতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দরি মধ্যে রচিত নুমিৎ কাপ্পা, পোইরৈতোন খুনথোকপা, হিজম হিরাও, খেমচো, লাইরেম্বা পাওসা, আনোইরোল, পাউসা তিল্লুক, পাম্ভোইবী খোংগুল সপ্তম শতাব্দীর সানা লমওক প্রভৃতি উল্লেখের দাবী রাখে। এসব কাব্যে দেখা যায় যে বিভিন্ন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে রচিত স্তোত্র এবং বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী সম্বলিত আখ্যান বিশেষ, গোত্র আর গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ বিসম্বাদের উপস্থিতি সেখানে লক্ষ্যনীয়, বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ, সহিংস রক্তপাতের চিত্রও সেখানে বিবৃত। অরণ্যের মাঝে কঠোর জীবন কিন্তু তা সত্বেও জীবনের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণের চিত্রও আমরা সেখানে পাই।

মধ্যযুগ ঃ-

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বংগদেশেব সিলেটের হিন্দু ধর্ম প্রচারকগণ মণিপুরে এসে ধর্ম প্রচারের মানসে বসবাস শুরু করেন। আর মণিপুররাজ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে সমগ্র মণিপুরী প্রজাদেরকেও হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন। নব দীক্ষিত মণিপুরী হিন্দুদের ধর্মীয় শিক্ষা তথা হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা দানের জন্য বংগদেশ থেকে ব্রাক্ষণ হিন্দুদের ব্যাপক হারে আগমন ঘটে। আর বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় অন্যান্য জাতিরও প্রবেশ ঘটে তখন। আর শান্তদাস গোস্বামী সহ হিন্দু পন্ডিতরা মণিপুরীদের প্রাচীন লোক কাহিনী, উপাখ্যান প্রভৃতিকে বিকৃত করে আর্য সংস্কৃতির সাথে একত্রীভূত করেন এবং উক্ত রাজ্যকে মহাভারতে উল্লেখিত মণিপুর বলে পরিচয় দিয়ে সমগ্র মণিপুরবাসিকে প্রতারণা পূর্বক মণিপুরীদের আপন লিপি, ভাষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে হিন্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেন। আর তখন মণিপুরের রাজা এবং প্রজারাও হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মে এত আচ্ছন্ন ছিল যে নিজেদের সমস্ত স্বকীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতিকে আপন সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করে। এভাবে ক্রমে ক্রমে মণিপুরীদের মনেও বদ্ধমূল ধারনা জন্মে যে তারাও আর্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরী। এই আর্য বংশদ্ভুত হওয়ার ধারণা মণিপুরী জাতির চেতনায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তারই প্রাণ-স্পন্দন বক্ষে ধারণ করে মধ্য যুগীয় মণিপুরী কাব্য সাহিত্য উন্মেষ লাভ করে। আর মণিপুরী কাব্যে এই সর্বময় জাতীয় বাসনার শিল্প প্রেরণাই স্বার্থক রূপ লাভ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

মধ্য যুগের কাব্য সাহিত্যগুলোর মধ্যে সমজোক ঙম্বা, তখেল ঙম্বা, অওয়া ঙম্বা, চিং খং ঙম্বা, গংগাচৎ পা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ের কাব্য সাধনার উপজীব্য প্রধানতঃ হিন্দু

পৌরানিক উপকথা বা মণিপুরের ইতিহাসের ঘটনাসমূহ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হলেও কিছু কিছু কাব্য চর্চার মধ্যে যে জীবনের অনুরণন ও সুর ধ্বনিত তা আরও পূর্ববর্তী অতীতকালের। তার বিস্তার সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগের কবিতাবলী থেকে আমরা ঐ যুগের জীবন ধারণ, আচার আচরণ ও নৈতিকতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি।

মণিপুরে যখন হিন্দুদের আগমন ঘটে, তখন হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্ত বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারতসহ বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থাবলী নিয়ে আছে। তাই স্বভাবতই এইসব বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর সংস্পর্শে এসে মণিপুরী সাহিত্যও এক নতুন প্রবাহে মোড় নেয়। অনেক মণিপুরী পণ্ডিত ঐসব ধর্মগ্রন্থের মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড় ঐ সময়ের হিন্দু ধর্ম প্রচারকদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলা ভাষাভাষি তাই সহজেই বাংলা সাহিত্যের সাথে মণিপুরীদের একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর ধর্ম প্রচারকরা নিয়ে এসেছিল বাংলার বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের মত উচ্চমানের সাহিত্য ধারা। এর ফলে অবশ্যম্ভাবি ভাবে মণিপুরী সাহিত্যেও বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের প্রভাবএসে পড়ে। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে একজন মণিপুরী সাহিত্যিক মন্তব্য করেন হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সমগ্র জাতি (মণিপুরী জাতি) হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। এর সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় তৎকালীন বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণ, স্তোত্র বা কবিতাংশে।

প্রাগ বৈষ্ণব প্রভাব যুগের একটি প্রার্থনা / মন্ত্র-

> হে লায়িংধৌ সনা মহি কৌবা ইপা ইবুংঙো
> হে ইপালাই ইপুলাই তশেংবা,
>
> ....
>
> নশাদগী হল্লক পা
> নয়োন্দগী শাৎলক পা
> লৈহাউ লৈরেল অথোইবি লৈরাংগী
> লৈশক খঙজগে হায়বনি
>
> ....

হিন্দু বৈষ্ণব প্রভাব যুগের পরে -

> ক্লীং হরসিক ....
>
> ....
>
> ....

রাম রাম রি রবি ক্লিং স্বাহা
হরি সনা রিক শং
হি তগুপ তরেংবা ইবুং ঙো
কুক কুক কুক রে রে রে।

সুতরাং এখানে দেখা যায় যে, বৈষ্ণব সাহিত্য তথা হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের ফলে মণিপুরী কাব্য সাহিত্যেও সংস্কৃত বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এভাবে মণিপুরী সাহিত্য, সংস্কৃতির সাথে মিলন ঘটে হিন্দু বৈষ্ণব সংস্কৃতি আর এ থেকে জন্ম নেয় নুতন ধরনের এক উন্নত সাহিত্যের ধারা। তবে একথা ঠিক যে ভারতীয়দের কাছ থেকে সংস্কৃতি গ্রহণের প্রবণতা সত্ত্বেও মণিপুরীদের নিজস্ব সংস্কৃতি অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সনাতন বৈশিষ্ট্যগুলি কখনই বিসর্জন দেয়নি। হিন্দু সংস্কৃতি তথা আর্য সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও এ দেশের মাটি ও মানুষের চরিত্রে মৌলিক কাঠামোগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মধ্যযুগীয় হিন্দু বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবান্বিত মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের অধিকাংশই বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশীরভাগই বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী। তবে এ কথাও ঠিক যে ঐ সময়ে রচিত অনেক কাব্যে অনেক সময়ই অ-হিন্দু বা বৈষ্ণব যুগের পূর্বের কিছু কিছু ভাবধারা এসে মিশেছে।

আধুনিক যুগ ঃ

আধুনিক মণিপুরী কবিতার যাত্রা শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং পরিপুষ্টি লাভ করে বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মণিপুর বৃটিশ সম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ন্যায় মণিপুরেও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ করে। আধুনিক যুগের উন্মেষকালের প্রধান প্রধান কবিরা হলেন লমাবম কমল, খাইরকপম চাউবা, হিজম অঙাংহল, হাওয়াইবম নবদ্বীপ চন্দ্র, অরাম্বম দরেন্দ্রজিৎ, অশাংবম মীনকেতন, রাজকুমার শীতলজীৎ, শঞ্জেনবম নদীয়া, রাজকুমার ঝলজীৎ ও এলাংবম রজনীকান্ত। তাঁরা সবাই মূলত ঃ রোমান্টিক ট্রাডিশনের কবি। ঐসব কবি সাহিত্যিকেরা চোখের সামনে দেখতে পান ইংরেজী জার্মান, ফরাসী, রাশিয়া ও বাংলা সাহিত্যের মতো উন্নত সাহিত্য ও সভ্যতা। এই উন্নত সভ্যতা ও সাহিত্যের পাশে নিজেদের সীমাবদ্ধতা দেখে এরা হতাশ হয়েছিলেন। অতিশয় শক্তিশালি ছিল এঁদের শব্দের কুহক। এই কবিদের রোমান্টিসিজমে বিদেশী সভ্যতা সাহিত্যের সংস্পর্শজনিত অভিযাত্রিক মনোভাবের প্রভাব পড়েছিল। ফলে দুর্দমনীয় আবেগ ও উচ্ছাস দিয়ে কবিতা লিখে এরা পাঠকদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারতেন। বর্তমানেও সেই রোমান্টিকতা কিছু মণিপুরী কবিদের কবিতায় উপস্থিত রয়েছে। এই সময়ে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল হিজম অঙাংহল এর ৩৯০০০ পদ সম্বলিত "খম্বা থোইবী শৈরেং" যা মণিপুরী কাব্য সাহিত্য তথা সমগ্র মণিপুরী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বোৎকৃষ্ট অবদান বলে স্বীকৃত।

পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরপর সংঘটিত দুটো বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবে যখন সমগ্র

পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের মন মানস বিপর্যস্ত তখন মণিপুরী সাহিত্যের দিক দর্শনেও এলো একটা পরিবর্তন-বিষয়ের আত্মতা রুপ নিলো বিষয়ের আত্মতায়। প্রতিচ্যের চোখ ধাধানো উন্নত সাহিত্যের প্রগলভ বাতাস সদ্যোম্মুক্ত বাংলা সাহিত্যের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলো অপ্রতিহত গতিতে আর জন্ম নিলো মণিপুরী সাহিত্যের এক নবতর ধারা। এভাবে মণিপুরী কবিতার জগতে আগমন ঘটে প্রকৃত আধুনিকতার নতুন ষ্টাইল, নতুন বক্তব্য, নতুন উপমা, উৎপ্রেক্ষা আর প্রতিকী ব্যাঞ্জনা নিয়ে আছেন বর্তমান কবিতার ধারায়। এই যুগ সন্ধিক্ষণে মণিপুরী কবিতার আখ্যানে বিচরণরত প্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন এলাংবম নীলকান্ত, রাজকুমার, সুরেন্দ্রজিং, লাইশ্রম সমরেন্দ্র, নোংখোম্বম শ্রী বীরেন, রাজকুমার মধুবীর, থাংজম ইবোপিশক, যুমলেম্বম ইবোমচা, খৈরুদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ। এদের মধ্যে অশাংবম মীকেতন, লাইশ্রম সমরেন্দ্র ও এলাংবম রজনীকান্ত নয়াদিল্লী সাহিত্য একাডেমী পদকে ভুষিত হয়েছেন।

মণিপুরের বাইরে মণিপুরী কাব্য সাহিত্য ঃ-

মণিপুরীরা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার ফলে ত্রিপুরা, আসাম, বাংলাদেশ সহ উপমাদেশের অন্যান্য রাজ্যের সংগে ঘনিষ্ট সংযোগ গড়ে ওঠে। আর বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে মণিপুরীরা ত্রিপুরা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলেও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন শুরু করেন। এখানে বাংলাদেশ ছাড়া আসাম ও ত্রিপুরার মণিপুরীরা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক কারণে মূল মণিপুর ভুখন্ডের সাহিত্যের ধারার সাথে একত্রীভূত হয়ে যায়। আসাম রাজ্যের কাছাড়, শিলচর, গৌহাটি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা, কৈলাস শহর, কমলপুর সহ বিভিন্ন শহর উপশহরকে কেন্দ্র করে মণিপুরী সাহিত্য চর্চার যে ধারা ক্রমশঃ বেগবান হচ্ছে তাতে অবগাহন করে অনেকেই স্বতন্ত্র সুর ও স্বকীয় বৈশিস্ট্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে ভারত সরকারের সহেযাগিতায় ১৯৫৪ সালে প্রাথমিক পর্যায় থেকে পাঠ্য সুচীতে মণিপুরী ভাষাকে অন্তর্ভূক্ত করেন।

বাংলাদেশে মণিপুরীদের বসবাসকালের ব্যাপ্তি কয়েক শতাব্দী হলেও মণিপুরী সাহিত্য চর্চার বয়স কিন্তু নিতান্তই অনুল্লেখ্য। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু সাহিত্য চর্চার অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মণিপুরী সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয় ১৯৭৫ সালে। "বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ" গঠন ও সংসদের অনিয়মিত মুখপত্র "দীপান্বিতা" প্রকাশের মাধ্যমে এর সুচনা ঘটে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের মণিপুরী সাহিত্য সংসদ তরুণ কবি এ.কে. শেরামের মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ 'বসন্ত কুন্তিপালগী লৈরাং' (আটাশ বসেন্তর ফুল) প্রকাশ করে। বস্তত ঃ এ কাব্য গ্রন্থই বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রথম মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ। এর পরে গত বার বৎসরে বাংলাদেশে কোন মণিপুরী কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ পাইনি। গত বৎসরে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে প্রতিশ্রুতিশীল দুই মণিপুরী তরুণ কবি এই অচলায়তন ভেঙে দুটি কাব্য গ্রন্থ বের করেন। কবি শেরাম নিরঞ্জমের "মঙ মপৈ মরক্তা" এবং কবি হামোম প্রমোদের 'ওয়াখলগী নাচোম' ঈনাৎ পাবিলিকেসন্স ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে

প্রকাশ করেন। এভাবে মণিপুরী সাহিত্য সংসদকে কেন্দ্র করে মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের যে চর্চা আবর্তিত হচ্ছে তার ফলে অনেকেই ইতিমধ্যে একটা নিজস্ব স্বতন্ত্রটা ও বৈশিষ্ট সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। এদেশের মধ্যে এ.কে. শেরাম. খোইরোম ইন্দ্রজিৎ, শেরাম নিরঞ্জন নিঃসন্দেহে স্বকীয় বৈশিষ্টে সমুজ্জল। এ.কে. শেরামের কবিতাগ্রন্থ 'চৈতন্যের অধিবাস', সনাতন হামোম এর 'কল্পবধু' 'ইপ্সিত বাসনা' কবিতা গ্রন্থগুলো সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উপসংহার ঃ

সাহিত্য একটা জনগোষ্ঠীর অন্তরতম পরিচয়ের দলিল, মণিপুরী সাহিত্যও মণিপুরী জাতির আত্ম পরিচয়ের ইতিহাস। মণিপুরীরা তাঁদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এখনও রক্ষা করে চলেছে। আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, প্রভৃতির ফলে তাঁদের জীবন ধারা বহু পরিবর্তন বহিরংগে লক্ষ্য করা গেলেও কৃষ্টিগত স্বতন্ত্র ও অনন্যতা এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে কোন জাতির সাহিত্যই তো তার সামগ্রিক জীবন বিকাশের শৈল্পিক প্রতিরূপ। তেমনি মণিপুরী কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসও শুদ্ধ মণিপুরী জীবন ঐতিহ্যের ধারক বাহক এবং পরিচায়ক। এই ইতিহাসের বিবর্তন পথে সংস্কৃত, বাংলা কিংবা ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা, সাহিত্যের যোগাযোগ প্রাসংগিক উপকরণ মাত্র তার বেশী কিছু নয়।

সাম্প্রতিক প্রবনতা দৃষ্টে আশংকা হয় মণিপুরী সাহিত্যে কবিতাকে দ্রুত পেছনে ফেলে মণিপুরী ভাষার কথা সাহিত্য এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কারণ হযতো কবিতার পাঠক প্রিয়তা ক্রমশঃ ক্রমে যাওয়া। তাই দেখতে পাই অনেক কবির পান্ডুলিপি প্রস্তুত থাকলেও প্রকাশক নেই, উৎসাহী পাঠক নেই. নিজের খরচে কখনো সম্পূর্ণ, কখনো বা আংশিক বই ছাপাতে হচ্ছে। তবে আমরা আশাবাদী মণিপুরী কাব্য সাহিত্য চর্চার যে ধারা ক্রমশঃ গতিময় হচ্ছে তা একদিন অনুকুল আবহাওয়ায় লালিত হয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং মণিপুরী সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল ভান্ডার ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে নিয়ে মিলিত হবে বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল মোহনায়।

হামোম প্রমোদ

বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল মণিপুরী সাহিত্যিকদের মধ্যে হামোম প্রমদে অন্যতম। মণিপুরী গল্প-কবিতা লেখার পাশাপাশি মণিপুরীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ধর্মী প্রবন্ধও নিয়মিত লিখে থাকেন। ১৯৯৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ওয়াখলগী নাচোম' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ কমলগঞ্জ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত মণিপুরী সাহিত্য সাময়িকী 'ইপোম' এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশী মণিপুরীদের একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মিৎকপথোকপা' এর সহেযাগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত। তাছাড়া 'দি মণিপুরী', ঢাকা এর তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্য

শেরাম নিরঞ্জন

মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" পাঠের পর জার্মান কবি গ্যেটের হৃদয়ে যে অনুরণনের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটা কি মূল গ্রন্থ থেকে উৎসারিত? নাকি, ইংরেজী কবি ডব্লিউ জনসন এর অনুবাদ থেকে প্রাপ্ত? সেই অনুবাদ থেকে যখন মণিপুরী কবি অশাংবম মীনকেতন অনুবাদ করেন তখন অনুবাদকের অজান্তে অনুবাদ কর্মে বিচ্ছুরিত হয় দুই মহাকবির কাব্য প্রতিভা। একারণেই অনুবাদ স্রেফ ভাষান্তর নয়। পশ্চিমা স্টাইলে রচিত শেক্সপীয়ারের কবিতা আমাদের হৃদয়ে অনুরনিত হয় প্রধানত অনুবাদকের গুনে। উৎকৃষ্ট অনুবাদ সাহিত্যের কারণেই রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ব কবি। হিন্দী কবি তুলশীদাশের রামচরিত মানস এর যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ হলে হয়তো তার নামের পাশেও শোভা পেতো বিশ্বকবি উপাধী। অনুবাদ সাহিত্যের বদৌলতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম আজ বিশ্ব সাহিত্যের মোহনায় গিয়ে মিলিত হচ্ছে।

মণিপুরী সাহিত্য অত্যন্ত প্রাচীন ও পূর্ব ভারতের অন্যতম উন্নত সাহিত্য। মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্য বিভিন্ন ভাষার বিখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মের অনুবাদে ঋদ্ধ। মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্যে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য কর্মের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেয়া। কালাচান্দ শাস্ত্রী অনুদিত 'মণিপুরী মহাভারত', ব্রজগোল শর্মা অনুদিত 'মণিপুরী ভাগবদ', নৃতন চন্দ্র শর্মা অনুদিত 'বালমীকি রামায়ন' প্রভৃতি ধর্মীয় সাহিত্যের অনুবাদ সম্ভবত ঃ ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রয়োজন থেকেই অনুদিত। এছাড়া সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের বেশ কিছু বই মণিপুরী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তন্মধ্যে গোকুল শাস্ত্রী অনুদিত 'সাহিত্য মিংশেল' (সাহিত্য দর্পন) সুরচান্দ শর্মা অনুদিত 'অভিনয় দর্পন' (নন্দকেশ্বর রচিত) এবং ভরত মুনির 'নাট্য শাস্ত্র' এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গুপ্ত যুগে রচিত 'নাট্য শাস্ত্র' ভারতের নাট্য শিল্পের বিশ্বকোষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অভিনয়, মঞ্চ সজ্জা ও অভিনেত্রীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই গ্রন্থটির অনুবাদ মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্যকে যথার্থই সমৃদ্ধ করেছে। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কতগুলি উৎকৃষ্ট মণিপুরী অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ব্রজবিহারী শর্মা অনুদিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', শুদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম' এবং মালবিকাগ্নী মিত্র, লৌরেনবম ইবোয়াইমা অনুদিত 'স্বপ্ন বাসবদত্তম' 'প্রতিমা নাটকম,' যৌগন্ধরায়নম (মহাকবি ভাস), গোকুল শাস্ত্রী অনুদিত 'উত্তরামচরিত' (ভবভূতি), রত্মাবরী (শ্রীহর্ষ) ইত্যাদি। শুদ্রকের মৃচ্ছকটিকম বিয়োগান্তক নাটক যা তৎকালীন শিল্পরীতিকে লঙ্ঘন করে রচিত হয়েছিল। এটি অনুবাদ করেন ব্রজবিহারী শর্মা। গনিকার প্রেমে মুগ্ধ দরদ্রি বনিকের কাহিনী নিয়ে রচিত নাটকটি যেমন তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট সাহসিকতার কাজ ছিল তেমনি মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ কর্ম সম্পাদন তদুধিক সাহসিকতা ছাড়া সম্ভব হতো না।

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুমন্থেম গৌরকিশ্বর অনুদিত কালিদাসের 'মেঘদূত' (মণিপুরী অনুবাদে 'লৈচিন দূতী') অত্যন্ত উন্নত অনুবাদ। এছাড়া 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের তিনটি মণিপুরী অনুবাদ আমরা পেয়েছি যেগুলি ব্রজবিহারী শর্মা, লৌরম্বম ইবোয়াইমা ও কালাচান্দ শাস্ত্রী কর্তৃক অনুদিত। এসব অনুবাদকের ভাষা ব্যবহার রীতিতে পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হলেও মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু তথা রাজ পুরুষদের চারিত্রিক নীচতা-হীনতা অতি নৈপুন্যের সাথে প্রত্যেক অনুবাদকই আঁকতে সক্ষম হয়েছে, যদিও কোথাও কোথাও ছন্দ পতন দৃষ্টি কটু ঠেকেছে।

ভক্তি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা এবং সংস্কৃত থেকে অনুদিত বেশ কিছু বইয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভগীরথ সিংহ অনুদিত "ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" (রূপ গোস্বামী), তোংব্রম গৌরমনি অনুদিত "শ্রী শ্রী রাস পঞ্চাধ্যায় (শ্রী শ্রী বেদব্যাস) গীত গোবিন্দ (জয়দেব), শ্রী হাওবম কুলবিধূ অনুদতি 'প্রার্থনা' (শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর), অঙোম গোপী অনুদিত 'রামায়ন' এসব উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে গীত গোবন্দি কাব্যটি দ্বাদশ শতকের একটি বিখ্যাত সৃষ্টি। অনুবাদক যথার্থ ভাবেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের প্রতীকে ভগবানের প্রতি প্রেমের সুক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা প্রাঞ্জল চিত্রকল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। মণিপুরে হিন্দু ধর্ম প্রবেশের পর এ গ্রন্থ অনুবাদ একটি নতুন কাব্য ধারা নির্মাণে অবদান রেখেছে। উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও সংস্কৃত কাব্য, নাট্য ও ভক্তি সাহিত্যের বেশ কিছু বই মণিপুরী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষার পরপরই যে ভাষার সাহিত্য মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ করেছে সেটি বাংলা। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসুদন সহ বাংলার বিখ্যাত সব কবি সাহিত্যিকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের মণিপুরী অনুবাদ পাওয়া গেছে। শ্রী শ্যামসুন্দর অনুদিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুন্ডলা', কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষ বৃক্ষ, আনন্দমঠ, দুর্গেশ নন্দিনী, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাস; শ্রী সুরচান্দ শর্মা অনুদিত শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এবং শ্যামসুন্দর অনুদিত 'দেবদাস' অত্যন্ত উন্নত অনুবাদ। মাইকেল মধুসুদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের তিনটি মণিপুরী অনুবাদ রয়েছে। সেগুলির অনুবাদক হলেন শ্রী মীনকেতন, শ্রী নবদ্বীপ চন্দ্র ও শ্রী নিঙোম্বম ইবোবী। এ তিন জন অনুবাদকের ভাষা ব্যবহার, প্রকাশ বঙ্গিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও মধুসুদনের কাব্য ভাবনা ও মূল বাংলার সুর অক্ষত রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয়ী 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থের মণিপুরী অনুবাদ বইয়ের ভুমিকায় এটাকে অনুবাদ না বলে রূপান্তর বলে উল্লেখ করেছেন এবং এ রূপান্তর ইংরেজী গীতাঞ্জলী থেকে একথা ও স্বীকার করেছেন। উল্লেখ্য, মণিপুরী ভাষায় অনুদিত অধিকাংশ বাংলা গ্রন্থই ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনুদিত।

মণিপুরী সাহিত্যের স্রোতে এসে মিলিত হয়েছে হিন্দি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ। হিন্দি সাহিত্যের উপন্যাস সম্রাটখ্যাত মুন্সি প্রেমচান্দ রচিত বিখ্যাত উপন্যাস "গোদান" এর মণিপুরী অনুবাদ করেছেন শ্রী নিশান সিংহ। অনুবাদ করেছেন ভগবতী চরন বর্মার "চিত্রলেখা"। এলাংবম দীনমনি অনুদিত জৈনেন্দ্রের "ত্যাগপত্র" বর্তমানে মণিপুর

বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরী সাহিত্যের এম.এ পরীক্ষার কারিকুলাম ভুক্ত। এছাড়া প্রেমচান্দ রচিত 'সপ্ত সরোজ" এর অনুবাদ করেছেন শ্রী ছত্রধ্বজ শর্মা। কফন, সরাসের গেহু, শতরঞ্জ খিলারী প্রভৃতি গল্প অনুবাদ করেছেন অরিবম কুমার শর্মা। শ্রী দীনমনি অনুবাদ করেছেন ধর্মবীর ভারতীয় "অন্ধাযুগ" এবং মোহন রাকেশের "অছার কা একদিন" অরিবম শর্মা অনুবাদ করেছেন জয় শংকর প্রসাদের "আকাশ দ্বীপ", "চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী রচিত "উস্নে কাহাথা", যশ পাল রচিত "পর্দা", অমৃতলাল নাগর রচিত "এটোমবম", বিশ্বম্ভর নাথ শর্মা রচিত "রক্ষা বন্ধন", ফনিধর নাথ রেনু রচিত "তীসবী কসম"।

মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্যে উর্দ্দু সাহিত্যের অনুবাদ কর্ম-অত্যন্ত স্বল্প এবং অনুল্লেখ্য হলেও কৃষ্ণ মোহন শর্মা অনুদিত রাজেন্দ বেদীর "এক চাঁদর মৈলীসি" এবং খোইরোম ইন্দ্রজীৎ অনুদিত কৃষন চন্দরের "মীনাবাজার" উল্লেখযোগ্য।

মণিপুরী অনুবাদ সাহিত্য জগতে ইংরেজী সাহত্যি থেকেও এসেছে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ। শেক্সপীয়ারের অধিকাংশ নাটক অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত মণিপুরী নাট্যকার জি,সি, তোংবা। HENRY IBSENT এর "A DOLLS HOUSE" এর অনুবাদও তিনি অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে করেছেন। মণিপুর ইউনির্ভাসিটিতে M.A. COMPERATIVE LITURA-TURE এর কারিকুলাম ভুক্ত। শেক্সপীয়ারের"দি রেপ অব লুক্রেস" এর অনুবাদ করেছেন শ্রী অশাংবম মীনকেতন। এছাড়া D.H. LAWRENCE, VIRGINIA WOLF, LEO TOL-STOY, BORIS-PASTERNAIK, PEARLS BUCK, JAMES JOICE, এর বেশ কিছু বইয়ের অনুবাদ কর্ম চোখে পড়েছে।

অন্যান্য ভাষার মধ্যে ফার্সী কবি ওমর খৈয়ামের "রুবায়াত" এর কথা উল্লেখ করা যায়। এটি অনুবাদ করেছেন ইরেং বিজয়। মারাঠী নাট্যকার বিজয় টেন্ডুলকর এর "সখারাম বাইন্দর" এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করেছেন লৈমপোকপম দামোদর সিংহ। এছাড়া উভয় বাংলার ষাট, সত্তর দশকের বিভিন্ন সাহিত্যিক-কবিদের উল্লেখযোগ্য কবিতা-গল্প মণিপুরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিচ্ছিন্ন অনুবাদ পরিলক্ষিত হয়। শেক্সপিয়ার, টলষ্টয়, হোমার, বার্নাডশ, সোফক্লিস প্রভৃতি লেখক এবং হিন্দি ও ইংরেজী সহ ভারতের বিভিন্ন ভাষা যেমন-মারাঠী, তামিল ইত্যাদি ভাষার সাহিত্যকর্মের অনুবাদ ও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ পেয়েছে।

শেরাম নিরঞ্জন

তরুণ প্রজন্মের বাংলাদেশের মণিপুরী সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি পরিচিত নাম শেরাম নিরঞ্জন। কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া প্রত্যেকটি মাধ্যমে তিনি সমান দক্ষতায় লিখে থাকেন। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি মণিপুরী সমাজে শিক্ষার উন্নয়নের জন্যও কাজ করে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে। তিনি বহুদিন বাংলাদেশ মণিপুরী ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং বর্তমানে উক্ত সংগঠনের 'বৃত্তি পরিষদের' পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর প্রথম মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ 'মঙ মপৈ মরক্তা' প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। তিনি 'শজিবু' নামে একটি মণিপুরী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনাও করে থাকেন।

মণিপুরী গল্প

একটি ইলিশ মাছের স্বাদ

নোংথোম্বম কুঞ্জ মোহন সিংহ

ভাষান্তর ঃ এ কে শেরাম

আকাশের চাঁদোয়ায় মিট্ মিট্ জ্বলছে নক্ষত্রেরা। মাঝে মাঝে একটি দু'টি করে ঝরেও পড়ছে। কানে এসে বাজছে বরাকের অশান্ত জলরাশির গর্জন ধ্বনি।

এখনো কেউ নদীতে নামেনি। শুধু বাপ-ছেলে। ছেলে বৈঠা বইছে, আর বাবা জাল হাতে প্রস্তুত হচ্ছে। ছেলের দিকে খেয়াল হতেই দেখে-ছেলেটি বৈঠা হাতেই একটু একটু ঝিমুচ্ছে। খেঁকিয়ে ওঠে বাপ-'এ্যাই মনি, সূর্য উঠি যার- আর তুমি এখনও বইয়া ঝিমাইরায়। চউখে মরিচর গুঁড়া লাগাই দিতামনি। জলদি পানিত মুখ ধুইয়া লও।'

নৌকার ভিতর বৈঠা রেখে মনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ধোয়। তারপর পরনের গামছার এক প্রান্ত দিয়ে মুখ মুছে আবার বৈঠা হাতে নেয়।

ছেলের প্রতি একটা মমতাবোধ জেগে ওঠে বাপের মনে। কোর্তার বাম পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাই বের করে ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, 'এই লও, একখান বিড়িই আছিল। লও ধরা দুই এক টান দিয়া আমারে দিস।'

বিড়ি ঠোটে চোপে মনি দেশলাই জ্বালাতে চেষ্টা করে। দুই তিন কাঠি নষ্ট করেও আগুন জ্বালাতে ব্যর্থ হয়। রাগে গর গর করতে করতে বলে 'শালা পানিত চুবাই দিলে ঠিক অইব।'।

'দেখি দেখি আমারে দেও। আইজকালকার শলইগুলোর যা অবস্থা একবায় খালি বারুদ লাগায়-খালি পয়সা লওয়ার ফন্দি'-বলতে বলতে বাপ এগিয়ে এসে দেশলাই জ্বালায়।

মনি বিড়িতে একবার মাত্র টান দিয়েছে তখুনি তাদের কানে আসে নদীর ওপারের সাধু বাবাজির কণ্ঠ "বম ভোলানাথ! জয় শিব শম্ভু!"

সাধু বাবা যখন জেগে গেছেন তখন ভোর হতে আর দেরি নেই। আরও অনেকেই নদীতে নামবে।

লোঙ্গোর বাবার ডহর-এর দিকে নৌকা চালায় বাপ ছেলে। এ জায়গা সম্পর্কে অনেকের মনেই একটা ভীতির ভাব কাজ করে। কিন্তু মাছ প্রচুর। পানি একটু বাড়লেই শুশুকে ভরে যায় জায়গাটা। মাঝে মাঝে ঘড়িয়ালও দেখা দেয়। গত বছর এমনি সময়েই গুলি করে একটা ঘড়িয়াল মারা হয়েছিল।

জালে একটু টান অনুভব করতেই বাবা আস্তে টেনে তোলে জাল। কিন্তু না কিছুই নেই।

বরং তাকে ব্যঙ্গ করেই ভুস করে একটা শুশুক ভেসে ওঠে নৌকার পাশেই। দু'তিনবার জাল টেনে ব্যর্থ হয়ে বাপ-ছেলে আরো দক্ষিণে নৌকা চালায়।

ইতোমধ্যে পাঁচ ছ'টা নৌকা পড়েছে নদীতে। দিনের আলোও ক্রমশ ফুটে উঠেছে। কিছুদূর যেয়েই নাউরেমদের ঘাটে এসে কপাল খুললো এদের। ধবধবে সাদা বেশ বড়োসড়ো একটা ইলিশ জালে আটকা পড়ে লাফালাফি করতে থাকে। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাদের চোখমুখ। মনির মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসে "ইস কী সুন্দর! খুউব মজা লাগবো, না বাবা?"

'এ্যাই চুপ, ইলান কইতো পারে না।' ধমক দেয় বাবা। ঘাটে কে যেন নেমে আসছে। ফিরে চাইতেই দেখে, নাউরেমদের ঘাড় মোটা বুড়োটা তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ডাক দেয়-'মনির বাপ! ও মনির বাপ!' মনির বাপ শুনেও শুনে না। বুড়োটাকে তার একদম পছন্দ না। জালে মাছের কথা শুনলেই রেখে দিতে চাইবে। কিন্তু দামের ব্যাপারে খুবই কিপটে। টাকা আছে অঢেল। অথচ এক আনা, চার আনার জন্যে দর কষাকষি করবে অনেক্ষণ।

বুড়োটাও নাছোড়বান্দা। বার বার ডাকছে তো ডাকছেই। উপায়ান্তর না দেখে সাড়া দেয় মনির বাপ-'কুন্তা কইরানি কাকা!'

'কয়টা ধরলাইরে বা?' বুড়োটা জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের একখান দিয়া যাও, আইজকাল পাকিস্তান থাকি ইলান মাছও আর আয় না। মাছ না খাইতে খাইতে জিবরাত লোম উঠি গেছে।'

মনির বাপ আপন মনে বিড় বিড় করে-'এতো কিপটা, পথর উপর কাকের বিটও উল্টাইয়া দেখইন পয়সা কিনা তোমার জিবরাত তো লোম উঠবোই।' তারপর একটু জোরেই উত্তর দেয়-'না একটাওই।'

"ঠিক আছে, এটাই আমাদের দিয়া যাও।"

আইজকে বাদ দিলাও কাকা। একটাইতো ধরছি, সুবিদা অইবো না।

রাজি হবে না বুঝতে পেরে বৃদ্ধটি আর কথা বাড়ায়না।

"এই বুড়ার লগে যখন দেখা অইছে, বুঝছি আইজ আর মাছ ধরন লাগবো না।" মেজাজটা বিগড়ে যায় মনির বাপের। বাপের কথায় যোগ দেয মনিও-'বুড়াটারে একদম দেকতাম পারি না আমিও। হেইদিন তার পুয়া তমালে মারছে আমারে। আমিও....।' কথা শেষ হয় না ছেলেটির। দেখে রহিমুদ্দিন বাপ-বেটার জালে ধরা পড়েছে চকচকে এক রূপালী ইলিশ। মনটা খারাপ হয়ে যায় দু'জনেরই। বাপের মুখ থেকে চাপা দীর্ঘ শ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে-মাইনষের তো দেখো, আইতে না আইতেই লাগি যায়। মাছটাকে যথাস্থানে রেখে দিতে দিতে ডাক দেয় রহিমুদ্দিন-'ও চাওবা ভাই কয়টা ধরলায়?'

'না, খালি একটাওই।'

'তাইলেও খরচতো উঠি গেছে। কাইল তিনটা ধরছিলাম গোটা চাইর টাকা কইরা বেছি।'

'হু, বেচলেতো টাকা পাইমু। কিন্তু আইজ আর বেচতাম নায়। আমার মাইয়া সামনে মা অইব। তারে এক বেলা ভাত খাওয়াইতাম। কইলে তো শরমের কথা, বেচতে বেচতে নিজে তো আর খাই না। ইলিশা মাছের স্বাদই প্রায় ভুলি গেছি। আইজ আর বেচনাতম নায় নিজেরাই খাইমু।'

বাপ ছেলে যখন বরাক থেকে ফিরে এলো তখন বেলা উঠেছে অনেক। মেয়ে তস্কার বানো দুধছাড়া গুড়ের চা যখন বারান্দায় বসে আয়েশ করে খাচ্ছে চাওবা তখনই তাদের গেট দিয়ে ঢুকলো কাহ্নাই। ঢুকতে ঢুকতেই ডাক দেয় কাহ্নাই, 'চাওবা, ও চাওবা! হুনলাম একটা ইলিশা বুলে ধরছো, হাছানি!'

কাহ্নাইয়ের গলা শুনেই চমকে ওঠে চাওবা। তার মনে পড়ে যায় কাহ্নাই তার কাছে সোয়া দু'টাকা পায়।

বাপ কিছু বলার আগেই সদ্য কথা ফোটা তার চটপটে ছোট ছেলে মুক্তা চীৎকার দিয়ে বলে ওঠে-'অয়, খুব বড়ো একখান ধরছে।' শিশু ছেলেটির কথা কাহ্নাই শুনেছে কিনা বুঝা গেল না। ছেলেটিকে ধমক দেয় বাবা, 'বেশি কথা শিখিলাইছস না? তোমার অত দরকার কিতা?' তারপর বাইরের দিকে মুখ করে জবাব দেয়-'কে কইলো তোমারে দাদা? আইজতো একটাও ধরছি না।'

'অয় অয়, না দরলে আর কিতা করবায়।' কাহ্নাই মন খারাপ করে চলে যায়।

মুক্তার আজ বড়ো আনন্দ। সে তার খেলার সাথী তোমচৌকে হাত-পা নাচিয়ে খুশির চোটে বলে-'হুনছনি, আইজ তো আমরা ইলিশা মাছ খাইমু। গাঙ্গরতন ধইরা আনছে আমার বাবায়-অততো বড়ো। তুমিতাইন খাইছনি কুনদিন?'

তস্কা বিষণ্ন মনে বেরিয়ে এসে বাবার হাতে তুলে দেয় সাজানো হুঁকো। তারপর ভয়ে ভয়ে বলে-'বাবা, অখন রানবার চাউলওতো নাই, কিতা করা যায় বাবা?'

কথাটা শুনামাত্র চাওবার সারা শরীর জ্বলে যায়। ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় মেয়ের দিকে-যেন ভস্ম করে দেবে। তামাকের নেশা কেটে যায়। ইচ্ছে হয়, সব ভেঙে চুরে ফেলে দেয়। আর ঠিক সে সময়েই কোনদিক থেকে যেন বেরিয়ে এসে উঠানের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে রোয়া উঠা এক বুড়ো কুকুর। সব রাগ গিয়ে পড়ে ঐ নিরপরাধ কুকুরটির উপর। কোন কিছু না ভেবেই বসার আসনটি ছুঁড়ে মারে। নিরপরাধ বলেই হযতো কুকুরটির গায়ে লাগে না। কেঁউ কেঁউ করতে করতে বাইরের দিকে পালিয়ে যায়।

রাগে গর গর করতে করতে হুঁকো হাতে ঘরের ভেতর ঢোকে চাওবা। তাকে দেখে নিরাময়হীন দীর্ঘ অসুখে ভোগা তস্কার মা পাশ ফিরে শোয়। বাইরে যে এতোকিছু ঘটে গেছে তার কিছুই না জেনে সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে-'মাইয়াটা যে কইলো চাউল নাই হুনছনি? কিতা করবায়?'

নিভে আসা আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হলো। ফট করে জ্বলে ওঠে চাওবা-'আর পারিয়ার না। মরবার অইলে মরি যাওগি কেতো আর মাইনষেরে জ্বালাইবায়?'

বাইরে কে যেন ডাকছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে চাওয়া বাইরে বেরিয়ে আসে। দেখে থানিনজাউ। নিজেকে কিছুটা শান্ত করে চাওবা জিজ্ঞেস করে-কিতা ব্যাপার?'

'আমরার থাবল্লে নাইওর আইছে। কিন্তু একটা মাছও খুইজা পাইলাম না। হেষে হুনলাম তুমি কয়টা ইলিশা ধরছো-এর লাগি আইলাম।'

'কয়টা না, মাত্র একখান ধরছি। ঘরো আইয়া দেখি যাও।' এই বলে চাওবা থানিনজাউকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে।

'কত নিবায়?' জিজ্ঞেস করে থানিনজাউ।

'আর কত-চাইর টাকাই দিয়ো। বরাকের ইলিশাও মজাওই।'

'আরে না-সাড়ে তিন টাকা দিমুনে'। এ কথা বলতে বলতে মাছ তুলে নেয় থানিনজাউ।

'টাকা কিন্তু এখনোই দিতে অইবো-চাউল কিনতাম।'

'আইচ্ছা আইচ্ছা। টাকা নিলেও নিতাই পারো। আর চাউল নিতে চাইলেও অসুবিদা নাই।'

মাছ হাতে নিয়ে থানিনজাউ বেরিয়ে আসে। সে যখন উঠানে এসে পৌছে, হঠাৎ মুক্তার চোখ যায় মাছটির উপর। বিস্মিত ছেলেটি জোরে চীৎকার দিয়ে ডাক দেয় বাবাকে-বাবা, বাবা, আমরার মাছ নিছেগি-আমরার মাছ নিছেগি।'

হঠাৎ ভাবাচ্যাকা খায় থানিনজাউ। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাট্টাচ্ছলেই ছেলেটিকে ধমক দিয়ে বলে ওঠে-'মাগনা নিরাম না পুয়া, পয়সা দিমুতো।'

কী বলবে বুঝে উঠতে পারেনা ছেলেটি। নির্বাক বিস্ময়ে স্থির তাকিয়ে থাকে নিয়ে যাওয়া মাছটির দিকে।

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহ

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহ। জন্ম ১৯৩৭ ইং। অর্থনীতিতে এমএ। পেশায় শিক্ষক, উল্লেখযোগ্য বই গল্পগ্রন্থ 'চেনখিদ্রবা ঈচেল' (থেমে যাওয়া স্রোত) এবং 'ইলিশা অমাগী মহাও' (একটি ইলিশ মাছের স্বাদ) এবং ভ্রমণ কাহিনী 'সোভিয়েতকী লৈবাক্তা' (সোভিয়েতের দেশে) 'ইলিশা অমাগী মহাও' গল্প গ্রন্থের জন্য ১৯৭৪ সালে ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান। অনূদিত গল্পটি ঐ গ্রন্থভূক্ত।

মণিপুরী গল্প

বিষণ্ন আকাশে সন্ধ্যাতারা

শামসুন নাহার (মিতা)

সুদুর দিগন্ত রেখা যেন এক দীর্ঘায়ুত ছন্দ। সীমাহীন আকশ আর অনন্ত সবুজের মাঝে কি নিবিড় মিলন। শ্রীভূমির এ অঞ্চলটিতে প্রকৃতির অফুরন্ত বিস্তার, নেই এখানে সভ্যতার কৃত্রিমতা। খেয়ালী বিধাতা যেন তার সৌন্দর্য্যের ভান্ডার উজার করে সাজিয়েছেন। অপরাহ্নের রোদ ঝলমল করছে চারিদিকে টিলাঘেরা বনানী। বলাকারা নীড়ে ফিরছে।

বসে আছি সেই চির পরিচিত স্থানটিতে চারিদিকে মিলনের সুমধুর মায়া। সবকিছুই আছে– সেই গাছপালা, সেই ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় কুটীর। তফাৎটা আগে আসতাম আমি আর তাপস, আজ শুধু একা আমি। এ একাকীত্ব আমার শুধু বাহিরের নয়-অন্তরেও নিঃসঙ্গতা আমায় গ্রাস করে বিশেষ করে বিকেল গুলো আমার কাটতে চায় না। এক দুর্বার আকর্ষণে ছুটে আসি এখানে, যেখানে কত অপরাহ্ন আমার কেটে গেছে তাপসের সাথে। তাপস আমায় তার শুচি স্নিগ্ধ মনের নিবিড়তায় ভরিয়ে রাখতো। তাপস আমাকে ভীষণ ভালবাসতো- যে ভালবাসা মাটির গভীরে গোপন কুঞ্জ ধারার মত। কিন্তু আজ? আজ তাপস আর আমি বিরহের তমসার দুই তীরে- যে ব্যবধান অলঙ্ঘনীয়।

"৭১ এর সংগ্রাম মুখর দিন গুলিতে ওর হৃদয়ের বিপ্লবী চেতনা আমি টের পেতাম, এক কঠোর শপথে ওর তারুণ্যময় মুখকে আরো দৃঢ় মনে হত। বাংলা মায়ের প্রতি ভালবাসার, শ্রদ্ধার যে হৃদয় সেই হৃদয় মায়ের অবমাননায় যন্ত্রণাক্ত। ওর হৃদয়ের উত্তাপ আমার ভালবাসার গভীরতা দিয়ে অনুভব করতাম। সান্তনা দিতাম এ কাল রাত্রির অবসান হবেই। জানতাম ও একদিন বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মত সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়বে। ওর মনের কথা বুঝতে পারতাম কথার মাঝে-আভাসে, এমনি এক হেমন্তের অপরাহ্নে জাফলং এর পাহাড় ঘেঁষা ক্ষুদ্র ঝর্ণাটির তীরে বসে ও ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। বুঝলাম ওর মনের উত্তাল সমুদ্রে সফেন তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ছে অস্থির আবেগে।

নীরবে পর্যবেক্ষণ করছিলাম ওকে, এক সময় বলল জান পিয়া, বাংলা মাকে আমি ভীষণ ভালবাসি কিন্তু আসল কথা মাকে ফাঁকি দিতে পারছিনা, জানইতো আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। মা ভীষণ শক্‌ড হবেন। তবু কর্তব্য আমায় ডাকছে। এ স্নেহ প্রেমের শিকল কেটে আমায় যেতেই হবে। তুমি অবুঝ নও লক্ষীটি! তুমি বাধা দেবে না। জানি তোমার ভালবাসা আমার পরম সম্পদ। তবু জন্মভূমির ডাক আর প্রিয়ার প্রেম এক নয় পিয়া। মহৎ প্রেম বন্ধন নয় মুক্তি।

ভাবনার রাজ্যে তলিয়ে গেলাম আমি। মন চলে গিয়েছিলো অতীত পানে-মুক্তি সংগ্রামের এক অগ্নি স্বাক্ষরের পট-ভূমিকায় তাপসের সাথে আমার পরিচয়। তখন বিপ্লবের আগুন পুরোপুরি জ্বলে উঠেনি। প্রস্তুতি চলছে। ওর প্রথম চিঠিতে লিখেছিল-"কে তুমি! যে আমার ঘুমন্ত সত্তার দ্বারে ভোরের পাখী হয়ে জাগরণী গান শোনালে।"

সত্যিই তো প্রিয়াকে ভালবাসা আর মাকে ভালবাসা পৃথক জিনিস। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসলে প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে তার ঋণ শোধ দিতে হয়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম ওর পানে। আঁখির ভাষায় পড়ে নিল আমার না বলা কথা। সুন্দর হেসে বলল, "তাইতো তোমায় এত ভালবাসি।" চোখে জল এসে গিয়েছিল। মুছিয়ে দিয়ে বলল, কেন ভাবছ আমি তো আবার ফিরে আসব। আর আসতে যদি না পারি তবুতো বেঁচে থাকব আমার বাংলা মায়ের লা-খো সন্তানদের অন্তরে। ওদের অন্তরের ভক্তি আর শ্রদ্ধার মাঝে লাখো শহীদদের সাথে বাঁচব যুগ যুগ ধরে। পারবে না তোমার মহৎ প্রেমকে সম্বল করে চলার দিশা খুঁজে নিতে?

বললাম- কেন অমঙ্গলের কথা ভাবছ? এতক্ষণের বর্ষনোদ্যত শ্রাবণ আকাশ যেন সহস্র ধারায় ভেঙ্গে পড়ল।

- তাপস, নিষ্ঠুরতা যে সহ্য হয় না। কেন মহৎ প্রেমের দোহাই দিচ্ছ? "ত্যাগ" কথাটা ভারী সুন্দর ছন্দময়। কিন্তু যে ত্যাগ করে তার মনের ভাষা কি কেউ পড়ে নিতে পারে? তার অন্তরের যে শূন্যতা তার পূরণ হয় কি দিয়ে? সমস্ত জীবনের চাওয়ার অবসান যখন ঘটাতে হয় তখন তার ভরা বুক কি খালি হয় না? সেই জীবন্মৃতের মত বেঁচে থাকা কি মৃত্যুর নামান্তর নয়? তার চেয়ে বলে যাও ভালবাসি না- মনে করব চাওয়ার মত চাইতে জানিনা তাই পাইনি।

আবার সেই সুন্দর হাসি আর কবিতার মত ছন্দোময় কথাগুলো-ভালবাসি-চিরদিন বাসব। জানি পিয়া, ঝিনুকের বুকে যখন মুক্তোর জন্ম হয় তার ব্যথা কেউ বুঝে না। শুধু তাই নয় তার বুক সর্বস্ব সেই মুক্তো উপহার দিতে হয় নিজের জীবনের বিনিময়ে। সব ভালবাসা সার্থক হয় না, মাল্যভূষিত হয় না জেনেও পৃথিবীর আদি থেকে মানব মানবী একে অন্যকে ভালবেসে আসছে। আমি নিস্তব্ধ নির্বাক।

ফেরার পথে আর কথা হয়নি। শুধু সারাটি পথ তাপস আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে নিবিড় করে ধরে রেখেছিল। এমনি কতদিন তাপসের হাতে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয়েছে এ আমার বড় নির্ভয়ের আশ্রয়, সারাটি জীবন নিশ্চিন্তে ওর হাত ধরে চলতে পার। সেদিন কিন্তু মনে হয়েছিল, নিতান্ত অসহায়-আশ্রয়, সারাটি জীবন নিশ্চিন্তে ওর হাত ধরে চলতে পারি। সেদিন কিন্তু মনে হয়েছিল, নিতান্ত অসহায়-আশ্রয় হারিয়েছি। অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল দু'চোখে। ধরা পড়ার ভয়ে মুছতে সাহস করিনি। কেমন করে ও টের পেল জানিনা, থমকে দাঁড়িয়ে আমার অশ্রুর বিচিত্র কারুকার্যময় মুখে তার গভীর

চোখের নিবিড় দৃষ্টি রাখল। মুখে মৃদু হাসি তখনো,-ভয় কি, আমি শুধু তোমারই। মৃত্যুও আমাকে আড়াল করতে পারবে না।-মনে হল আর ভয় নেই কোন কিছুতেই, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর নেই। চোখ বুজে ওর প্রশস্ত বুকে মাথা রাখলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। মনে হল সিলেটের বিষণ্ন আকাশে সন্ধ্যা তারাটি বড় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে আর সমগ্র তারাভরা আকাশ আমাদের পানে থমকে চেয়ে আছে। শ্যামল বনানী আরও সবুজ হয়েছে-উতলা বাতাস নাম না জানা ফুলের সুরভি নিয়ে আসছে।

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সময় পেলেই তাপস চিঠি লিখত। অনেক আশা, অনেক স্বপ্নের কথা। শুধু চিঠিই আমাদের যোগসূত্র হয়ে রইল। একদিন তা'ও রইলো না। যুদ্ধ তাপস আর পিয়ার ভালবাসার মাঝে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করল, যা কোনদিন কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না।

দেশ স্বাধীন হল। তাপস ফিরল না। তার অভিনন্দন মালা আমার বুকে শুকনো ফুলের সুবাস নিয়ে আজো জেগে আছে। আজ আর চুপি চুপি তাপস আমায় পিয়া বলে ডাকেনা। পিয়া নামের মেয়েটির অবসর সময়কে মধুময় করে তুলে না। তাপস আজ হারিয়ে গেছে সীমাহীন অন্ধকারে। বাংলা মায়ের স্বাধীনতা যজ্ঞে তাপসের জয়দৃপ্ত আত্মা উৎসর্গীকৃত।

এতক্ষণের অতীত স্মৃতিচারণ ক্ষেত্র থেকে কঠোর বাস্তবে ফিরে এলাম প্রচন্ড কোলাহলে। মনে পড়ল আজ ১৬ই ডিসেম্বের- বিজয় দিবস। আজকের এ আনন্দ মেলার জন্য আমার মত হাজার বঞ্চিতা প্রিয়া রক্ত-ঋণ দিয়েছে। তাপসের আত্মা কি আজ খুশী হয়েছে? আজকের এ উৎসবে তাপসরা কোথায়? নাম না জানা ফুলের মত মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে তাপসরা কি আজ বিস্মৃতির মরুভূমিতে ঝরে গেছে? ওদের কথা কি সবাই ভাবছে? আমি তো জ্বালিয়ে রেখেছি নিশিদিন বিরহের চিতা। তাপস আজও বেঁচে আছে আমার ভালবাসার মাঝে ঠিক হেমন্তের ম্লান বিষণ্ন আকাশে উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারাটির মতো।

শামসুন নাহার (মিতা)

মণিপুরী মুসলিম বা 'পাঙল' সম্প্রদায়ের একজন প্রতিভাময়ী লেখিকা শামসুন নাহার মিতা। জন্ম, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪। অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মণিপুরী মুসলিমসামজে তাঁর মতো সুশিক্ষিত, প্রতিভাসম্পন্ন লেখিকার আবির্ভাব ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত। আজ থেকে দশ- পনর বছর আগে মণিপুরী মুসলিমদের মধ্যে মেয়েদের লেখাপড়া ছিল বিরল। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমাজের সকল শৃঙ্খল ছিন্ন করে নিজেকে সুশিক্ষিত এবং একমাত্র মণিপুরী মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই অনেকে তাঁকে মণিপুরীদের বেগম রোকেয়া বলে অভিহিত করেন। 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদে'র প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই তিনি জড়িত ছিলেন। এ গল্পটি 'বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত মণিপুরী সাহিত্য পত্রিকা 'দ্বিপান্বিতা' প্রথম সংখ্যা (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫) থেকে সংগৃহিত। তিনি মণিপুরী ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও লিখে থাকেন।

মণিপুরি গল্প

পেবেতের গল্প

এলাংবম দীনমনি

অনুবাদ : কন্থৌজম সুরঞ্জিত

যেকোনো একটি সময়।

পেবেত যেনো আর জায়গা খুঁজে পেলোনা, এক ভিখিরি বেড়ালের মাথার উপরে কাংলাতেই আশিটির মত ডিম পাড়লো। মনে হয় তাদের বাপ আলাদা, ডিমগুলো বিভিন্ন রঙের, একই রঙেরও দু'একটি ছিল বৈকি। বহুবর্ণিল ডিমগুলো খুবই সুন্দর। ওম দিতে দিতে পেবেত ভাবে সন্তানেরা বড় হলে বাগানে ফোটা ফুলের মত দেখতে ভালোই লাগবে।

একটি একটি করে ডিমগুলো ফোটে যখন বাচ্চা হয় সেই সময়ই বিড়ালের আবির্ভাব। বেচারা বহুদিন ধরে ডাল আর ভাঙা চাউলের ভাত খাচ্ছে; দেশ থেকে পাচার হয়ে আসতে আসতে পচে যাওয়া বোয়ালের হাড্ডি চিবাতে চিবাতে কবেই যে দাঁতে ব্যাথা ধরে গেছে! আজ অন্তত একটি পেবেত ছানা মুখ ভরে খেতেই হবে-এই-০ই ভুখানাঙ্গা বিড়ালের পণ।

- এই মনমরা পেবেত!

- কি ...

- ইয়া ...! বলো, আমি কেমন সুন্দর?

- কি যে বরবো, সুপারম্যান! বোমা দিয়ে গাঁথা মালা, মেগজিন ভর্তি গুলি, টাটকা রক্তভরা কলসির মত সুন্দর তুমি।

- ঠিক আছে। ঠিক আছে। যাচ্ছি!

- আসেন আসেন...!

- ফিরে যায় বিড়াল। পরে তার মন গ্লানিতে বিষিয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ নাই, পানি নাই, ভাঙা রাস্তা, ব্রীজ বানায়না... এসব বলে স্লোগান দিলাম অথচ পেবেতের চোখের কোণে উছলে পড়া হাসি নিয়েই ফিরে এলাম। অন্যকে শুনিয়ে যাই বলুক বুড়ো ভিখির কিন্তু ভেতরে ভেতরে সত্য ঘটনা ঠিকই বুঝে। প্রেক্ষিত-পরিস্থিতি সম্পর্কে পেবেতের ভালই জ্ঞান। অন্তর্ভেদী এক স্থিরতা নিয়ে নির্মোহভাবে ডিমে তা দিয়েই চলত। এখনও দেখো, শুয়েই আছে! সন্তানগুলো কোলে। ওর নির্মোহ ভাব বেড়ালের মনের আগুনে ঘি ঢেলে চলে।

পাঁচ-দশ দিন পর বাচাগুলো খাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে রওনা দিল বিড়াল।

- ঘম ঘম ঘম ...

কিছুটা মেজাজ দেখিয়ে ডাকে,

পেবেত!

- এই- য়ো য়ো... নাকি সুরে বিরক্তি প্রকাশ করে।

- চেহারা টা.....?

- আরে, তুমিতো ধর্মঘটের মিছিল, হাইওয়ে ভর্তি ব্লোকেট, জনগণের শাসন, পাতিলের তলায় লেগে থাকা কালির মত সুন্দর, অনুজ!

- ঠিক আছে। দাড়া! তোকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

রাগ করে ভিখিরি চলে যায়। পেবেত এবার বুঝতে পারে ভিখিরি বেড়াল ভীষণ রাগ করেছে। ইতোমধ্যে শরীরে ডানা গজিয়ে ওঠা সন্তানগুলোকে তাই লাইন বেধে দাঁড়াতে বলে। থাঙ-তা-মুসল-মুদগ্র; মুক্না-কাংজেই, বলিখেলা, মাঙজোং, য়েৎতা লেইবা, ওইদা লেইবা, মাঙদা থৌবা-তুংদা হনবা....এক কথায় কারাতের দেশজ সব কসরত শেখালো। অবলা, বোকা মা নয় পেবেত। সন্তানদের ঠিক সময়ে উড়তে শেখায়-

- ইচাঝা-সন্তানেরা, পায়ে দাড়াও!

- জি- ই ...

- ইচাঝা, ডানা মেলাও!

- জি- ই ...

- ইশাঝা-শ্বা!

বলার সঙ্গে সঙ্গে রানওয়েতে কিছু সময় দৌড়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে বাচ্চাগুলো। ঝাঁক বেধে, ধীরে ধীরে... আরও উপরে। পেবেত জোরে জোরে নির্দেশ দেয়–

- আরও উপরে! একটা থেকে আরেকটাতে, এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে; এক দল থেকে আরেক দলে.....

এখন শরীরটাকে ডান দিকে বাঁক, কাংলা উল্টে যাবে। পেছনের দিকে বাঁকাও দেখবে উল্টোউড়ন শুরু হয়ে গেছে।

মায়ের শিক্ষাতো যৎকিঞ্চিৎ। লাইপোক হওয়ার কারণে নতুন নতুন অনেক কিছু নিজে নিজে শিখে ফেলে। যেগুলো শেখায়নি সেগুলোও পথে চলতে চলতে শিখে। খাওয়ানো, খাওয়া, কামড়ানো, পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে বিশ, বিশটা থেকে পঞ্চাশ। পঞ্চাশ থেকে এক লাফে পাঁচশত। এভাবে যখন বাচ্চাগুলো পাঁচশ পাঁচশ করে অসংখ্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করার কৌশল শিখে নিয়েছে সেই সময় অগ্নিশর্মা রূপে ভিখিরির পুনরায় আগমন। সবটিকে একসাথেধ শেষ করার উদ্দেশ্যে এসেই চিৎকার দেয়-

এই পেবেত! রাষ্ট্র খাদক!

- তুই তো অন্যের খাওয়া দেখে দেখে লালা ঝরাও!

- কি? এত বড় স্পর্ধা! আচ্ছা বলো, আমার চেহারাটা কেমন সুন্দর?

- আবার সুন্দর! বিড়ালের আবার কিসের সুন্দর রে? গাছে ফল ধরেছে কিনা না জেনেই কাঁধে শূন্য পুটলি নিয়ে গাছতলায় আর বাঁশঝাড়ে ঝাঁকি মারো। কি হবে না হবে, কি খাওয়াই না খাওয়ায়; উচ্ছিষ্টের দিকে বেহুশ হয়ে দ'হাতে বাড়াও; মেজাজ দেখানো ছাড়া বোকার হদ্দের কি করার আছে? সন্তানগুলোকে যখন আমি ভালোভাবে তা দিচ্ছি তুমি তখন পেকের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছ। তুমি তো সুন্দর হবেই, চামড়া যে উঠে গেছে কবে, লোমও ঝড়ে গেছে, রাকড়িতে রান্না করা পাতিলের তলায় জিহ্বা দিয়ে চাটছিলে না, কালি তো লাগবেই। দিলে খাও না দিলে অন্যের খাওয়া দেখে দেখে তোমার লালা পরে। তুমি তো তোমার মতোই সুন্দর!

- ইয়া! উ-ম! বিড়াল কোনো জবাব দেয়না।

- ইচাঝা, শ্বা, আমার পেছনে এসো!

বেড়াল হামলা দেওয়ায় প্রস্তুত নিতেই নীড় থেকে বাচ্চাগুলো বের হয়ে মায়ের পিছু নিয়ে আকাশে সারি সারি উড়ে যায়। রঙ বেরঙের পেবেতবাচ্চাগুলো এক ডাল থেকে আরেক ডালে এক দল থেকে আরেক দলে, এক পতাকা থেকে আরেক পতাকায় উড়তেই থাকে।

এদিকে ভিখিরি বিড়ালও কম যায়না, পুরাণ উৎপাটনে অংশ নেয়া ধূর্ত বেড়াল বলে কথা, ফুঙ্গা লাইরুর দিকে তড়িৎ গতিতে ঢোকে। তুবিয়াতা (বাঁশের তৈরি তামাক রাখার কৌটো বিশেষ) জায়গামত পড়ে আছে অথচ পুরাণকথা মতে হাতের তালুতে খাওয়ার জিনিষটি রেখে যাওয়ার জন্যে যে বাচ্চা পেবেত থাকার কথা, তা তো অনুপস্থিত।

বিষ্ঠা খাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বেড়াল আকাশের দিকে তাকায় যেন কিছু সংকেত পেয়েছিল। দেখে, সব পেবেত বাচ্চা চিল হয়ে গেছে। চিলগুলো ভিখির-ভিখিরিনীর মাথার ওপর ধীরে ধীরে চক্রাকারে উড়ছে। শরীরে হাত দিয়ে নাড়স্পিন্দনটুকু দেখে নেয় বিড়াল, ভাবে- এই যা, আমি এখনো মৃত নয়!

পেবেত : এক পৌরাণিক কল্পপাখি।

কাংলা : ইম্ফালে অবস্থিত। সেখানে সমবেত হয়ে জাতপাত নির্বিশেষে সকল মণিপুরি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নিত। উপনিবেশ শাসনের আমলে কাংলায় সেনাবাহিনীর ক্যাম্প বসানো হয়। ২০০৪ সালে থাংজম মনোরমার শহীদে শতাধিক বছর পর ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হল।

ফুঙ্গা লাইরু : গৃহ নির্মাণের আদিবাসী রীতি অনুসারে ঘরে ঘরে দেবতার আসনগুলো নির্দিষ্ট করা হয়। ফুঙ্গালাইরু হচ্ছে ঘরের মূল কেন্দ্র, নাভীর মত। সেখানে পূর্বপুরুষ ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের নিবিড় ঠিকুজি লেখা আছে। সাহিত্যের দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফুঙ্গাওয়ারি নামে মণিপুরি সাহিত্যে যে বিশাল পরিসর দখল করে আছে

তার উৎপত্তিও এই ফুঙ্গাকেই কেন্দ্র করে। প্রায় সারা বছর শীতল আবহাওয়ার সেই অঞ্চলে সবসময় ফুঙ্গাতে আগুন থাকতো। উনুনের ধারেই ফুঙ্গা লাইরুর বাস। জানা যায়, ব্যাষ্টিক পর্যায়ে বিপন্ন ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে প্রায়োগিক পন্থাও বের হয়েছিল ফুঙ্গার পাশে বসে আলোচনার মাধ্যমেই।

সেই অঞ্চলে বাংলাদেশের ইলিশ বোয়ালের. অন্যরকম কদর। এখনো নাকি 'চাঁনপুরি ইলিশা'র কথা মুখে মুখে। উল্লেখ্য, ইলিশা অমগি মাহাও (একট ইলিশ মাছের স্বাদ)-এর জন্যে এন কুঞ্জমহন সিংহ ১৯৭৪ সালে দিল্লীর সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস অনুবাদের জন্য গত বছর (২০০৪) দ্বিতীয় বারের মত তিনি একই পুরস্কার পেলেন।

লেখক কথা :

ড: এলাংবম দীনমনি মণিপুরি সাহিত্যে সুপরিচিত গল্পকার। জন্ম ইম্ফাল, মণিপুর। ১৯৮২ সালে ছোটগল্পের বই পিস্তোল অমা কুন্দালৈ অমা এর জন্যে দিল্লীর 'সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড' পান। ইমৈসুনি তৌরাসুনি হঙ হঙ এর জন্যে ১৯৮৫ সালে 'মণিপুর স্টেট কলা একাডেমি' পুরস্কার পানুলিখিত দুটি গ্রন্থ ছাড়াও থকুবী (১৯৭০), মোরাম্বী আঙাওবী (১৯৭৪), তিংখংলৈ (১৯৭৭), মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র (১৯৮৬), লাইরেল মরীম্বোং (১৯৯১), কেগে মখোঙদা সার্টিফিকেট (১৯৯৫), লাইকিশি (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য। ভাষান্তরিত গল্পটি তাঁর লাইকিশি গল্পগ্রন্থের। গল্পকার বর্তমানে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান।

অনুদিত গল্পটি কথা নামের ছোট কাগজ থেকে সংকলীত, সম্পাদক : কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর একুশে ফেব্রুয়ারি-২০০৬।

মণিপুরী কবিতা

প্রশ্ন

এলাংবম নীলকান্ত

রাস্তায় সভায় লাইব্রেরিতে
লোকে বলাবলি করে
ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন
আমি ভাবি একা-মনে মনে
সত্যিই কি ঈশ্বর আছেন?
পবিত্র পাহাড়ে আরোহণ করছে
শিশু বৃদ্ধ যুবা
জীবনের একটি নতুন প্রাপ্তির প্রত্যাশায়
প্রনাম জানায় তারা ঈশ্বরকে-সিঁদুর মাখে কপালে।
অথচ, বাংলাদেশে তখন বয়ে যায় রক্তের বন্যা
নির্বিচারে নিহত হয় নিরপরাধ লোকেরা,
ঈশ্বর এ তোমার কেমন বিচার?
কিছুই বোঝে না নিহত সেই ছয় লক্ষ নারী-পুরুষ, ছাত্র-বৃদ্ধ,
এক নারী কেবল একাকী কাঁদে রাত্রির প্রেত প্রহরে,
বিষণ্ন দাওয়ায় বসে
একমাত্র সন্তান হারাবার বেদনায়,
অথচ বারুনী পাহাড়ের মহাদেব তো কাঁদেন না
তিনি শুধু অপেক্ষায় থাকেন কৃপাপ্রার্থী সহস্র ভক্তের।
শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে।
আর একজন ভক্ত তখন মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে
একাকী কাঁদছেন বিধ্বস্ত হৃদয়ে।

এলাংবম নীলকান্ত

মণিপুরী কবিতায় প্রকৃত আধুনকতার সূত্রপাত যে ক'জন কবির হাত দিয়ে এলাংবম নীলকান্ত তাদের অন্যতম। জন্ম ১৯২৭ইং। অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ইম্ফাল এর সভাপতি। কবিতার জন্যে ভারতের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এ কবিতাটির মণিপুরী শিরোনাম 'ওয়াহং'। এ কবিতাটি এপ্রিল ১৯৭১ অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যে রচিত।

বলির পশু

কাঙজম ইবোহল সিংহ

বলির পশুটিকে
গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আনা হলো
দেবতার সম্মুখে,
ঠিক তার পাশেই
বিশাল খড়্গ হাতে এক লোক
গভীর তৃপ্তিতে ঢোক গিলে
প্রস্তুত হয়ে
দণ্ডায়মান।

নির্বোধ পশুটিও
তার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানে।
মৃত্যুর মুহূর্তে তাই
সে শুধু ভাবে-
এক মুহূর্তের জন্যে
যদি আমি পাশে দাঁড়ানো ঐ লোকটি হতে পারতাম।

কাঙজম ইবোহল সিংহ

জন্ম ১৯৪৬ইং। মণিপুরী ভাষার একজন সব্যসাচি লেখক কাঙজম ইবোহল সিংহ। তিনি একাধারে কবিতা, গল্প, উপন্যাস সব কিছুতেই সমান দক্ষতাই লিখে থাকেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক মিলে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৫টি। এ কবিতাটির মণিপুরী শিরোনাম ছিল 'বলিগী শা'।

আফ্রিকার হৃদয় থেকে

লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ

তোমার নির্বোধ ভাবনা থেকে
তোমার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ থেকে
বিচ্ছুরিত গুলির আঘাতে
জ্বলে পুড়ে শুকনো পাতার মতো খসে গেছি
মিশে গেছি আমি মাটির ধুলিকনায়
তারপর নতুন বৃক্ষের শরীরে প্রবেশ করে
আবার সবুজ পাতা হয়ে যাই
আমি
আগুনে-বোমার আঘাতে
মাটিতে পড়ে গেলে
মুহূর্তে পায়রা হয়ে যাই
স্বর্গের পাখিরা এসেনিয়ে যায় আমার হৃদয়
আফ্রিকার সাহারা-নাইজেরিয়ায়
আরবের মরু প্রান্তরে
ভিয়েতনাম ফ্রান্স ইন্দোচীন
কোরিয়ায় পৌছে
নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয় আমার নতুন প্রাণ-নতুন দেহ
নতুন হয়ে যাই আমি
হিটলারের বুটের নিচে নির্দয়ভাবে দলিত মথিত
নাৎসী ট্যাঙ্ক-টাক্টারের চাকার তরায় পিষ্ট
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিষ্পেষিত আমার দেহ
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া আমার হাড়গোড়!
তারপরও উঠে দাঁড়াই আমি
শুধুমাত্র মানুষের ভালোবাসার উষ্ণতায়
বন্ধু,
নতুন সূর্যের আলোকে আড়াল করে রেখেছ তুমি
তোমার গলিত দূষিত সভ্যতা
পরিত্যক্ত আজ
বাতিল আজ সময়ের স্রোতে!
আমি দেখছি সমস্ত কিছু

সুউচ্চ পাহাড়ের শিখর থেকে
অপেক্ষায় আছি আমি সেই সময়ের জন্যে
যখন তোমার হৃদয় থেকে তিরোহিত হবে
কুয়াশার ঘন আচ্ছাদন।

লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ

জন্ম-১৯২৫ইং। আধুনিক মণিপুরী কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। মূল কবিতা-আফ্রিকাগী ওয়াখন্দগী। অনূদিত কবিতাটি 'মমাং লৈকাই থম্বাল শাৎলে' গ্রন্থের অন্তর্গত-যে কাব্যগ্রন্থের জন্যে তিনি ভারতের সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড পেয়েছেন ১৯৭৬ সালে।

অরণ্য দীপিত হোক

এ.কে. শেরাম

এই ক'দিন আগেও তো এমন ছিলো না
এখন সুগভীর অরণ্যানী আমার চারিদকি
ক্রমশঃ গ্রাস করছে
অরণ্যের ভাষা আমি বুঝি না
সে গম্ভীর নির্ঘোষ- সে নিকষ কালো শব্দাবলী
আমার কেবল দীর্ঘ ন'মাসের কালো রাত্রি বলে ভ্রম হয়
আমি বিমূঢ় হ-হতচকিত হই
অন্তর্লীন একবিস্ময়ে আর বেদনায় হতবাক হই
ঈশ্বর
তুমি তো আমার হৃদয়ে চেতনার দীপাবলী জ্বালো
তুমি তো তোমার চকিত বিদ্যুতালোকে খণ্ডিত করো আমার
অহংবোধের নিরংশী অন্ধকার
অতএব ঈশ্বর
আমি চাই
তোমার দীপ্তির একটুকু রেশ একবার বিচ্ছুরিত হোক
সে বিচ্ছুরন একবার শুধু দাবানল হোক
শুধু একবার সে অরণ্য দীপিত হোক।

এ.কে. শেরাম

এ.কে. শেরামের এ কবিতাটি 'বসন্ত কুন্নিপালগী লৈরাং' (আটাশ বসন্তের ফুল) ১৯৮২ ইং নামক তাঁর প্রথম মণিপুরী কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এ কবিতার মণিপুরী শিরোনাম ছিল 'উমং অনেক ঙাল্লসনু'। বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি নিজেই। এই কবিতা গ্রন্থটিই বাংলাদেশের প্রথম মণিপুরী ভাষার কাব্যগ্রন্থ।

বিশ্বপ্রেম

লমাবম কমল সিংহ

বিজ্ঞান বিশারদ যে যুবকবৃন্দ!
কেন মন্ত্রকে বিশ্বাস করোনা?
প্রেমের মন্ত্রে যদি বাঁধা পড়ো কোনোদিন
তাহলে চোখ থাকলেও অন্ধ হয়ে যাবে
বধির হবে কানে শুনেও,
বুদ্ধিমান হয়েও বোকা বনে যাবে।
বাতাস চুরি করে নিয়ে যায় ফুলের সৌরভ
তবুও যেমন বলি কি মধুর গন্ধ!
তেমনি প্রিয়জন যদি চুরি করে মন
তবু বলি প্রিয় সে- ভালোবাসি, ভালোবাসি
কেতকী ফুলের কাঁটা যতোই বাড়ুক
সুগন্ধ তার ছড়িয়ে পড়বেই
যতোই মান অভিমান করুক প্রিয়জন
তবু আরো প্রিয় মনে হবে তাকে
মনের মানুষ যদি বকুনিও দেয়
কোনো তেতো ঔষধের ক্রিয়ার মতো
শরীর আরো সতেজ হবে
নিমেষে চাঙ্গা হবে মন।
রাগ যদি করে তাতেও ভালোই লাগবে
ভেংচি কাটলে মনে হবে হাসি।
প্রিয়জনের কণ্ঠ থেকে
খুলে নিয়ে সোনার হার
পরিয়ে যে দিতে পারে শত্রুর কণ্ঠে
সে'ইতো প্রকৃত প্রেমিক।
(অনুবাদ- এ.কে. শেরাম)

কবিতাটি এক বসন্তের ভালোবাসা কাব্য থেকে সংকলিত। সম্পাদক : মুতুম অপু সিংহ

মদের নেশায় নয়

রঘু লৈশাংথেম

আমি যে সব সময় নেশাগ্রস্ত থাকি
তা মদের নেশায় নয়
আমার এই ছোট্ট দেশটার নেশায়।

আমার এই জীবনে
এই নেশাকে ছাড়তে পারিনি
কখনোই
তাইতো আমি আজও নেশার ঘোরে
আর এই নেশায় আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমার এই ছোটট্ট দেশটি
কেন ক্রমশঃ ঢেকে যাচ্ছে ঘন অন্ধকারে
কেন মানুষগুলোর চোখে অশ্রুর ধারা
এই প্রশ্নেরই জবাব
খুঁজতে খুঁজতে আমি নেশাগ্রস্ত।
আজ এই নেশার ঘোরেই
আমার এই ছোট্ট দেশটির জন্যেই
কবিতা লিখছি আমি রক্তের অক্ষরে।

আমি যে সবসময় নেশাগ্রস্ত থাকি
তা মদের নেশায় নয়
আমার এই ছোট্ট দেশটির নেশায়।
(অনুবাদ-এ. কে. শেরাম)

কবিতাটি এক বসন্তের ভালোবাসা কাব্য থেকে সংকলিত। সম্পাদক : মুতুম অপু সিংহ

বিপ্রতীপ

হামোম প্রমোদ

'বলেছিলে ভুলবোনা এ জীবনে আমরা আমাদের
প্রতিজ্ঞা করেছিলে ভালোবাসার সুতোয় বাঁধব দুজন'
শুয়ে শুয়ে ভাবি আমি সেই অচল শপথের কথা
হৃদয়ের গভীর খচ্‌খচে করে ওঠে এক অচেনা ব্যথা

একদিন আমি বলেছিলাম লক্ষী-সরস্বতী
চন্ডী-বেহুলার ধারা তুমি-তুমিও বলেছিলে
রাধা-কৃষ্ণ, খম্বা-থোইবীর অমর কাহিনী
কিন্তু আজ রাধা-কৃষ্ণে, খম্বা-থোইবীতে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশঃ
চেতনার চারিদিকে এক রহস্যময়ী পাপেটের ওড়াওড়ি
সামনে দাঁড়িয়ে আছে দূরন্ত এক মহিষ
হিংস্র কুকুরের গর্জন ভেসে আসে ইথারে ইথারে
পলায়নপর মা কালীর ভুলের মাশুল দিচ্ছে রক্তাক্ত জিহ্বা
অর্থাৎ কোথা থেকে য্যানো পালিয়ে এলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে
সীতা, দ্রোপদী, মাইনু, পেমচা, এই উন্মুক্ত ময়দানে
আর অন্ধ গহ্বরে আত্মধিক্কারে হাতড়াতে থাকে
দেবরাজ ইন্দ্র, জিউস, পাখংবা, মহাদেব
রাবন, দূর্যোধন আর নোংবানের দু'চোখ অশ্রুশিক্ত আজ
ক্লীওপেট্রা, মোনালিসা, শন্দ্রেম্বীর হাসিতে প্রশান্তি খুঁজতে গিয়ে দেখি
ছোট ছোপ রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে স্তনাগ্র থেকে নাভিমূল

কে তুমি বসে আছে পুষ্পরথে?
হৃদয়ের স্পন্দনে তুমি কি বিচলিত নও?
একবার তাকিয়ে দেখো চেতনার শার্সিতে
বলে যাও একবার কে?

আমি ভঙ্গি পরিবর্তন করে শুয়ে থাকি পূনরায়।
(অনুবাদ - শেরাম নিরঞ্জন)

কবিতাটি এক বসন্তের ভালোবাসা কাব্য থেকে সংকলিত। সম্পাদক : মুতুম অপু সিংহ

মণিপুরের মা

সুবোধ সরকার

নগ্ন উঠে দাঁড়াল আমার মণিপুরের মা
এই মায়ের দু'চোখ থেকে চোখ পেয়েছি
আশিরনখ ভাষা পেয়েছি, পেয়েছি সা রে গা মা
নগ্ন উঠে দাঁড়াল আমার মণিপুরের মা।

যা খুশি তাই করতে পারে আর্মি আর
পুলিশ, পথে কার্ফ্যু, জ্বলে চারমিনার
কারও কিছু বলার নেই, বলার কতা না
নগ্ন উঠে দাঁড়াল আমার মণিপুরের মা।

আর্মি জিপ চলে গগনতলে
আর্মি জিপ 'সারে জাঁহাসে' বলে
আর্মি জিপে মেয়েটি আছড়ায়
আর্মি জিপে বোতাম খোলা চলে।

ও মেয়ে যদি ফিরেও আসে ঘরে
ও মেয়ে যদি গগনতলে মরে
পুলিশ মুছে দিয়েছে তার নাম
বাড়ি কোথায়? ইম্ফলের বাইরে কোনও গ্রাম!

এ সব ঘটে রোজ
কোথায় কোন তরুণী পড়ে আছে
কোথায় তার অন্য বোন নিখোঁজ
শুধু তাদের চুনুরি ঝোলে গাছে

কিন্তু আজ জুলাই মাসে হারাল বিপদসীমা।

উঠে দাঁড়ান মণিপুরের মা
উঠে দাঁড়ান নগ্ন হয়ে স্তন্যদায়িনীরা
পৃথিবী দেখ, মায়ের বুকে ক'খানা উপশিরা!

কেমন লাগে নগ্ন হলে তোর নিজের মার?

আসাম রাইফেলস যেই বন্ধ করে গেট
যেখানে আমি ছিলাম সেই মায়ের তলপেট
সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক গরম গঙ্গা
মণিপুরের মায়েরা দিল মা-কে নতুন সংজ্ঞা।
যেখানে আজ মায়েরা হাঁটে নগ্ন হয়ে মিছিলে
স্থলনায়ক, জলনায়ক, তোমরা তখন কী
করছিলে?
ভাবছ নাকি তোমার মা এখনও আছেন পরমা?
পুড়ে গিয়েছে, পুড়ে গিয়েছেন...

সব মায়ের মধ্যে থাকা নিজেই সেই বড় মা।

কবিতাটি সুবোধ সরকারের কাব্যগ্রন্থ মণিপুরের মা থেকে সংকলিত।

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদে

ইশতিয়াক আলম

শান্তি নিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শেখাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গুরু বুদ্ধিমন্ত সিংহ-এর পুত্র রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের আগরতলার বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন শিলচর থেকে ইম্ফলের সড়কপথ দুর্গম, তার উপর রয়েছে পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে তল্লাশি ফাঁড়ির বিড়ম্বনা। পরামর্শ দিয়েছিলেন বিমানে যেতে। তার পরামর্শ রাখতে পারিনি। বিমান ভাড়ার বর্ধিত ব্যয় সঙ্কোচই শুধু নয় সড়ক পথে যেতে দেশ দেখার দুর্লভ সুযোগও হারাতে চাই না বলে রাত তিনটার বাসে উঠি সপরিবারে। তেরো ঘন্টার দীর্ঘ এবং বিরক্তিকর যাত্রা শেষে ইম্ফলের হোয়াইট প্যালেস হোটেলে উঠে কাউন্টারে বললাম, এই ঠিকানায় যেতে চাই।

বাঙালি ম্যানেজার বাংলাদেশের প্রথম কাষ্টমার পেয়ে পরামর্শ দিলেন, আজ থাক। আগামীকাল যাবেন।

কারণ আর জিজ্ঞেস কররাম না। পৌনে তিনশ কিলোমিটার আসতে বাইশবার তল্লাশি ফাঁড়ি পেরুবার সময়ই বুঝেছি মণিপুর ডিস্টারবড এরিয়া। ওয়ানখেম বীরমঙ্গল টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল, কাউন্টার থেকে সেই নম্বরে ফোন করলাম। বিপরীতে সাড়া পেতে বললাম বাংলাদেশের মণিপুরী কবি এ. কে শেরামের কাছ থেকে এলাংবম নীলকান্ত সিংহ-এর চিঠি ও বই নিয়ে এসেছি। নিজের পরিচয়ও দিলাম।

ওদিক থেকে জানানো হলো, সভাপতি বাইরে রয়েছেন।

মণিপুরের প্রধান কবি অধ্যাপক এলাংবম নীলকান্ত সিংহ শুধু এই রাজ্যের নয় ভারতেরও জাতীয় ব্যক্তিত্ব। সেমিনার উপলক্ষে কেরালায় গিয়েছেন। তাঁকে না পেলেও অসুবিধা হলো না টেলিফোন ধরেছিল জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি অফিসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। এর পরে আর ম্যানেজারের নিষেধ কে শোনে।

রাজধানী ইম্ফল খুব বড় শহর নয়। শহরের এমাথা থেকে ওমাথা বিস্তৃত রয়েছে যে দুটি সমান্তরাল সড়ক তার একটির নাম থাঙাঁল রোড। ১৮৯০ সালে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে জেনারেল থাঙ্গাল ছিলেন মণিপুরের সেনাবাহিনী প্রধান। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত জেনারেলের স্মরণে নির্মিত সড়কটি ওয়ান ওয়। রিকশা নিলে অনেক ঘুরে যেতে হবে জেনে হেঁটেই রওনা হলাম। সন্ধ্যা হয়নি, এরই ভেতর প্রায় সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েক গজ পর পর সশস্ত্র সি আর পি। কিছুদুর যেতে ডানে পড়ল শতকরা একশত ভাগ মহিলা বিক্রেতাদের বাজার খায়রমবন্দ। থাঙাঁল রোড বামে টার্ন নিয়ে আবার সোজা হলে রাস্তার নাম হয় পাওনা বাজার। হিন্দী বা ইংরেজীতে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে জবাব আসে, আগে। এই সড়কের শেষ সীমানায় জাতীয় বীর টিকেন্দ্রজিৎ এর স্মরণে নির্মিত টিকেন্দ্রজিৎ পার্কের কাছাকাছিতে পাই মণিপুর সাহিত্য পরিষদ। প্রধান রাস্তার পাশেই টিনের দোতালা কার্যালয়। আয়তাকার ঘরটির পেছনদিকে পার্টিশন দিয়ে পৃথক করা হয়েছে। এখানেই পেলাম জেনারেল

সেক্রেটারি ডঃ টিএইচ ইবোহানবি সিংহকে। চেয়ারে বসা ছিলেন দুজন বয়সী ভদ্রলোক। তাদের সঙ্গেও পরিচয় হলো নিংথৌখোংজম খেলচন্দ্র সিংহ এবং হিজম গুনো সিংহ। খেলচন্দ্র বাংলাদেশে এসেছেন, বাংলা জানেন। পরিষদকে দেওয়া আমার মেঘ পাহাড়ের কোলে বইটি নিয়ে বাংলাদেশে মণিপুরী প্রসঙ্গটি পড়লেন আগ্রহের সঙ্গে। প্রতীক প্রকাশনীর এই বইটির প্রোডাকশনের প্রশংসা করলেন। আলাপের ভেতর এলেন আর কে ঝলঝিৎ সিংহ। তিনজনই কথাবার্তায় আন্তরিক। পোশাক সাধারণ; দেখে মনে হতে পারে স্বদেশী রাজনীতির অবসরপ্রাপ্ত তিন নেতা নয়তো মফস্বল কলেজের অংকের অধ্যাপক। পরে পত্রপত্রিকা পড়ে দেখি এরা তিনজনই মণিপুরের মহারথী। এন, খেলচন্দ্র হিস্ট্রিকাল সোসাইটির সভাপতি ছাড়াও আর্কাইভস, মিউজিয়াম, ড্যান্স একাডেমীর মত জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনা পরিষদের সদস্য। সাহিত্য ও গবেষণামূলক বিষয়ে তার প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা অর্ধশতাধিক। সাহিত্যিক হিসেবে পেয়েছেন পদ্মশ্রী উপাধি। 'আরিবা মণিপুরী সাহিত্যগি ইতিহাস' বা প্রাচীন মণিপুরী সাহিত্যের ইতিহাস তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মণিপুর সাহিত্য পরিষদের সাবেক সভাপতি হিজম গুনোসিং দু'দুবার দিল্লি থেকে পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার। প্রথমবার ১৯৮৫ সালে নাট্যগ্রন্থ "বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড" এবং ১৯৯২ সালে অনুবাদ কর্মের জন্যে। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাজকুমার ঝলজিৎ সিংহ সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক টিএইচ ইবোহানবী সিংহ কলেজের অধ্যাপক পিএইচডি করেছেন প্রাচীন মণিপুরী কবিতার উপর।

আমার কৌতুহলী প্রশ্নে খেলচন্দ্রের পরামর্শে ইবোহানবি সিংহ আলমারী খুলে বেশকিছু পত্রপত্রিকা ও সুভ্যেনির বের করে দেন। আলাপচারিতায় জানতে পারি সক্রিয় এই পরিষদের সূচনা ও বর্তমান কার্যক্রম। যে ঘরে বসে কথা হচ্ছিল সেই ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে ১৯৬৮ সালে। ইম্ফল শহরের কেন্দ্র বিন্দু পাওনা রোডে সরকারিভাবে বরাদ্দ একটি প্লটে। পরিষদের সূচনা হয় ষাট বছর আগে। ১৯৩৫ সালে 'মণিপুরী সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি সংগঠন গড়ার চেষ্টা নেয়া হয়। এ বছরই ১০ অক্টোবর একটি অধিবেশনে সংগঠনের নতুন নামকরণ করা হয় 'মণিপুর সাহিত্য পরিষদ'। ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে লাইরেনময়ুম ইবুংঙোহল এবং দ্বিজমনি দেব শর্মা। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মহাকবি হিজম অঙাংহল সিংহ, কবি খাইরাকপম চাউবা সিংহ, কবি হওয়াইবম নবদ্বীপচন্দ্র সিংহ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হিজম ইরাবত সিংহ প্রমুখ। উত্তর পূর্ব ভারতে আসাম সাহিত্য পরিষদের পরে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদের স্থান প্রাচীনতা এবং সক্রিয়তার দিক থেকে। পরিষদের বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন মণিপুর রাজ্যের বর্তমান সময়ের প্রধান কবি শ্রী এলাংবম নীলকান্ত সিংহ।

পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) মণিপুরী ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রসারের জন্যে কাজ করা।

(খ) মণিপুরী সাহিত্যের উন্নয়নে কাজ করা এবং মণিপুরী ভাষা লেখকদের উৎসাহিত করার

মানসে যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান, প্রশংসাপত্র ও মেডেলসহ উপাধি দেওয়া।

(গ) পরিষদের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারসহ সাহিত্যকর্ম প্রকাশের লক্ষ্যে একটি মুখপত্র প্রকাশ করা।

(ঘ) মণিপুরী ভাষা সাহিত্যের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করা। ১৯৩৭ সালে পরিষদের মুখপত্র ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। যার নিয়মিত প্রকাশনা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ২৭.১২.১৯৩৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম বারের মত কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে উপাধি প্রদান করা হয় ১৯৪৮ সাল থেকে সঙ্গীত ছাড়াও সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণীজনদের উপাধি প্রদান শুরু হয়। সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধির মধ্যে রয়েছে (সাহিত্য) ১. সাহিত্যরত্ন, ২. সাহিত্যভূষণ (নট অভিনয়) ১. নটগুরু ২. নটবিশারদ (নৃত্য) ১. নৃত্যগুরু ২. নৃত্য বিশারদ (কাব্য) ১ কবিতরত্ন ২. কাব্যভূষণ। (নাট্য) ১ নাট্যরত্ন ২. নাট্যবিশারদ। (গবেষণা) ১. গবেষণা শিরোমণি ২. গবেষণা ভূষণ। (সঙ্গীত) ১. সঙ্গীতাচার্য ২. সঙ্গীত রত্ন। (শিল্পকলা) ১. শিল্পরত্ন ২. শিল্প বিশারদ। (বাদ্য) ১. বাদ্য শিরোমণি ২. বাদ্য বিশারদ।

উপরোল্লিখিত উপাধি ছাড়াও সাহিত্য সংকীর্ত্তন, গৌরনীলা ইত্যাদি বারোটি ক্ষেত্রে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মেডেল প্রদান করা হয় সাহিত্য পরিষদ থেকে। মেডেলসমূহ বিভিন্ন খ্যতিমানদের নামে এবং তাদের উত্তরসুরিদের অর্থানুকূল্যে প্রদত্ত হয়ে থাকে। সৃষ্টি ধর্মী ও উৎকৃষ্ট কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের জন্যে নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল ব্যবস্থা।

খেলচন্দ্র সিংহসহ উপস্থিত সবাই জানতে চান বাংলাদেশের মণিপুরীদের সম্পর্কে। আমার জানার পরিধি সীমিত জানিয়ে বলি বিস্ফরোণোন্মুখ জনসংখ্যার বাংলাদেশে মণিপুরীদের সংখ্যা খুবই কম। দেশের মোট জনসংখ্যার শূন্য দশমিক এক শতাংশ মাত্র। তিনটি জেলায় তাদের বসবাস। রক্ষণশীলতা এবং প্রবল জাত্যাভিমানের কারণে সামাজিকভাবে গরিষ্ঠ জনগণের সঙ্গে তাদের মেলামেশা কম। কিন্তু তারা মাতৃভাষাকে লালন করে পারিবারিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যত্নে রক্ষা করে সামাজিকভাবে। শিক্ষা বিশেষ করে স্বাক্ষরজ্ঞান এবং আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশের গড় মানের চেয়ে মণিপুরীদের অবস্থান অনেক উন্নত।

রাত বাড়তে উঠে পড়ি। পরিষদের একজন তরুণ সদস্য রিকশায় উঠিয়ে রিকশাওয়ালাকে বুঝিয়ে দেয় হোটেলের ঠিকানা। পরদিন আবার দেখা হবে বলে বিদায় নেই। পাওনা রোডে লোকজন থাকলেও ব্যস্ত থাঙ্গল রোড এবং মাহাত্মা গান্ধী মার্গে আলো আধারীর খেলা অন্ধকারের আড়ালে নিশ্চুপ প্রহরায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সশস্ত্র সিআরপি। শঙ্কা জাগলেও ঠিক পৌঁছে যাই কলাপসিবল গেট বন্ধ করা হোটেলের সামনে।

দ্বিতীয় বার যখন মণিপুরী সাহিত্য পরিষদে পৌঁছি তখনো সন্ধ্যা। কারণ সারাদিন কাটে রাজধানী শহর ও শহরতলির দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শনে। সঙ্গ দেয় পরিষদের এক তরুণ সদস্য।

সন্ধ্যায় পৌঁছে জেনারেল সেক্রেটারী ইবোহানবিকে পাই তার টেবিলে। যথারীতি ব্যস্ত। সে

যে কলেজের অধ্যাপক তার অবস্থান ইম্ফল থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে। প্রতিদিন সে বাসে যাতায়াত করে। এরপরেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিষদ কার্যালয়ে কাটায় তিন ঘন্টা। স্বল্পভাষী কিন্তু নিবেদিত।

দ্বিতীয় দিনেও খেলচন্দ্র সিংহ এবং হিজমগুনো সিংহকে পাই। আরো পাই তরুণ কবি ডিকে মধুবীর, সাংস্কৃতিক কর্মী আরজু সিংহ, থোকচম রোশন সিংহ এবং ভাষা আন্দোলনের ছাত্রনেতা লেইহাও থাবম শরৎচন্দ্রকে। স্বাভাবিকভাবেই এদিনেই আলোচনায় প্রাধান্য পায় ভাষা, মণিপুরী ভাষা।

পাহাড়বেষ্টিত মণিপুর রাজ্যের লোকসংখ্যা আঠারো লাখের কিছু বেশি। মণিপুরীদের বাস সমতল ভূমিতে। তারা ব্যতীত উনত্রিশটি উপজাতি বাস করে পাহাড়ী এলাকায়। তাদের ভাষা পৃথক। মণিপুর রাজ্য ছাড়াও মণিপুরী ভাষাভাষীরা বাস করে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে এবং কিছু সংখ্যক ভারতের বাইরে বাংলাদেশ ও বার্মায়। জনসংখ্যায় কম হলেও মণিপুরী বা মৈতৈ ভাষা বিশ্বের উন্নত ভাষার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা রাখে। কারণ এই ভাষা শুধু যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো তাই নয় মণিপুরী ভাষার সাহিত্যও সমৃদ্ধ। মৈতৈ ভাষায় লিখিত রূপের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তম শতাব্দী থেকে। অবশ্য কথ্য ভাষার বয়স অনেক প্রাচীন।

মণিপুরী ভাষা মঙ্গোলীয় ভাষা পরিবারের তিব্বত ব্রহ্ম শাখার কুকি-চীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে এবং এই বর্ণমালার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক একটি বর্ণের নামকরণ করা হয়েছে মানবদেহের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নামানুসারে। বর্ণগুলির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য দেহের ঐ প্রত্যঙ্গের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। যেমন বাংলা ক এর মণিপুরী প্রতিবর্ণ হচ্ছে 'কোক' যার বাংলা অর্থ মাথা। পরবর্তী মণিপুরী বর্ণগুলি হচ্ছে 'সম' অর্থ চুল, 'লাই' অর্থ কপাল 'মিৎ' অর্থ চোখ, 'পা' অর্থ ভ্রু, 'না' অর্থ কান এবং সর্বশেষ বর্ণ হচ্ছে 'আতিয়া' অর্থ আকাশ। মণিপুরী লিপি সম্ভবত ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভুত। তিব্বতি লিপির সঙ্গেও এর সাদৃশ্য রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম শতাব্দীতে মণিপুরের প্রথম মহারাজা পাখংবার (৩৩-১৫০ খৃষ্টাব্দ) সময়ে ১৮টি বর্ণসহ মণিপুরীলীপি প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে মহারাজা খাগেম্বার শাসনামলে (১৫৯৬-১৬৫১) কয়েকটি বর্ণ সংযোজিত হয়। বর্তমানে মণিপুরী বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা সাতাশটি।

একাদশ শতাব্দীতে মহারাজ পামহৈবো বা গরীব নেওয়াজ-এর শাসনামলে (১৭০৯-১৭৪৮) এ ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে মণিপুর রাজ্যে। বঙ্গদেশ থেকে সম্ভবত সিলেট অঞ্চল থেকে গমনকারী বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শান্তদাস গোস্বামীর কাছে মহারাজা সনাতন ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নতুন ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রবর্তন করেন। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য গ্রন্থসমূহ ভস্মীভূত করা হয়। বাংলা বর্ণমালায় মণিপুরী ভাষা লিখবার প্রচলন করেন। সেই থেকে বাংলা বর্ণমালাতেই মণিপুরী ভাষা লিখিত হয়ে আসছে।

মৈতৈ ভাষা শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজ্যভাষা এবং শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ইংরেজদের অধীনে এলে মৈতৈ ভাষার চর্চা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হয়। ১৯২৫

সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রধান ভাষা ছিল বাংলা। ১৯৬৩ সালে মণিপুরী ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবি উত্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে জাতীয় দাবিতে রূপান্তরিত হয়। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ক্রমাগত দাবি ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৭.৮.৯২ তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্ট এক বিলপাশের মাধ্যমে মণিপুরী ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসীলের অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশাল ভারতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভাষার সংখ্যা ১৬৫২। এর মধ্যে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ও অষ্টম তফসীলভুক্ত ভাষার সংখ্যা মাত্র আঠারোটি। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৮ সালে মণিপুরী সাহিত্যকে বিএ ক্লাসের একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমানে মণিপুরী ভাষা মণিপুর রাজ্য ছাড়াও আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। সাহিত্য বিষয়ে ভারতের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান দিল্লীস্থ সাহিত্য একাডেমী ১৯৬৭ সালে মণিপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৩ সাল থেকে মণিপুরী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের জন্যে নিয়মিতভাবে সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রদান শুরু করে।

সাহিত্য পরিষদের কার্যালয়ে বসে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে সহজেই জানতে পারি মণিপুরী সাহিত্যের ইতিহাস। মণিপুরী সাহিত্যের ক্রমবিকাশকে চারটি যুগে বিভক্ত করা হয়। যেমন প্রাচীন যুগ- দূর অতীত থেকে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে রচিত সাহিত্য, প্রাচীন মধ্যযুগ ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ, নবীন মধ্যযুগ- ১৭০৯ থেকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ এবং আধুনিক যুগ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। মণিপুরী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ঔগ্রী যা বৈদিক স্তোত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

৩৩ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের প্রথম মহারাজ পাখংবার সিংহাসনে আরোহণকালে সূর্যদেবতার উদ্দেশে এই গীতিধর্মী শ্লোকসমূহ নিবেদিত হয়েছিল। লিখিত সাহিত্য চর্চার শুরু অষ্টম শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ গরীব নেওয়াজের সময়ে হিন্দু ধর্ম প্রচারকদের প্ররোচনায় ভস্মীভূত হয় প্রাচীন লিপিতে লিখিত বহু মূল্যবান পান্ডুলিপি। তবে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া পান্ডুলিপির সংখ্যা সহস্রাধিক। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে মণিপুরী সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। বাংলা থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থও অনুবাদ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মণিপুরী সাহিত্যে আধুনিকতার শুরু এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে। বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত লেখকদের হাতে বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে চাউবা, কমল, অঙাংহল এই তিন পুরুষ হচ্ছে মণিপুরী সাহিত্যের আধুনিক ধারার পথ প্রদর্শক। এরাই মণিপুরী ভাষায় প্রথম রচনা করেন আধুনিক আঙ্গিকের ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক। এদের রচিত ও বহুল আলোচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে ডাঃ লমাবম কমলের উপন্যাস 'মাধবী', খাইরাকপম চাউবার কাব্যগন্থ- 'থায়নগী লৈরাং', ঐতিহাসিক উপন্যাস 'লবঙ্গলতা', রাজকুমার শীতলজিৎ এর ছোটগল্প সঙ্কলন, 'লৈকোন্নুন্দে' এবং মহাকবি হিজম অঙাংহল এর খন্ড কাব্য 'শীংঙেন ইন্দু', নাটক 'ইবেম্মা'। এছাড়াও ৩৯০০০ পদ সংবলিত খাম্বা থোইবীর চিরন্তন প্রেমের মহাকাব্য হিজম

অঙাংহলের 'খাম্বা থোইবী শৈরেং' মণিপুরী সাহিত্যের এক গর্বিত ঐতিহ্য। পরবর্তীতে তাদের সুযোগ্য উত্তরসুরি হয়ে এগিয়ে আসেন আশংবম মীনকেতন, লাইশ্রম সমরেন্দ্র সিংহ, এলাংবম নীলকান্ত সিংহ, শ্রী বীরেন, নোংথোম্ব কুঞ্জমোহন সিংহ প্রমুখ কবি ও কথা সাহিত্যিকবৃন্দ। তাদের সাহিত্যকর্ম শুধু যে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করেছে তাই নয় সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার ও পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়ে মণিপুরী ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে মণিপুরী ভাষায় প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ সালে। জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যাও সীমিত। এ পর্যন্ত প্রকাশিত সাহিত্য গ্রন্থ সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। হাতের কাছে পাওয়া এক তালিকা থেকে দেখা যায় ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫২টি। অর্থাৎ নাটক ১১১, ছোট গল্প ১১৮, উপন্যাস ১০৩ এবং কবিতাগ্রন্থ ১২০টি। তবে সংখ্যায় স্বল্প হলেও অনুবাদসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মণিপুরী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ প্রায় প্রতি বছর দিল্লিস্থ জাতীয় সাহিত্য একাডেমী থেকে পুরস্কৃত হয়। সাহিত্যকর্মের জন্যে মণিপুরের আটজন ব্যক্তিত্ব ভারতের অত্যন্ত মর্যাদাবান পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই রাজ্যে ভৌগোলিক সন্ধ্যা নামে আগে ভাগে। আর রাজনৈতিক কারণে শহর নীরব হয় সন্ধ্যার পরপরই। দুদিনেই অন্তরঙ্গ হওয়া তরুণ ইবোহানবি সিংহ বিনীত গলায় জানায় রাত করা ঠিক হবে না। নবীন ও প্রবীণ সাহিত্য কর্মীদের পাশে বসে ছবি তুলি। ক্যামেরাটি আমার বলে কথা নেই দেশে পৌঁছে ছবি কপি পাঠাব। শার্টার টিপার সময় বুঝতেই পারিনি যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ফলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের গ্লানি ভোগ করতে হয়।

করমর্দন করে রিকশায় উঠি। চলমান চাকা ধীরগতিতে পেছনে ফেলতে থাকে দু'দিনের পরিচিত অন্তরঙ্গ ক'জন সাহিত্য কর্মীকে, ছোট হতে হতে আড়াল হয় দোতলা টিনের ঘরের মণিপুর সাহিত্য পরিষদ। বিষাদ ভারাক্রান্ত হয়ে প্রতিবেশী এই রাজ্যে আর কখনো কি আসা হবে?

ইশতিয়াক আলম

পর্যটক-লেখক ও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত ইশতিয়াক আলম মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে মণিপুরী সম্পর্কে বিভিন্ন নিবন্ধ বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মণিপুরী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রয়েছে অগাধ পান্ডিত্য। মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সমস্ত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে পৌঁছে ছিলেন সুদূর মণিপুর রাজ্যের (ভারতের) রাজধানী ইম্ফালে। যা অকল্পনীয়। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করে মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশে। সেগুলো থেকে মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধটি অনেকটা ভ্রমণ কাহিনীর মতো লিখেছেন। ইশতিয়াক আলম শিশু সাহিত্যে 'অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য' পুরস্কার পেয়েছেন। তাছাড়া তাঁর অনেক ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

১. ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রাপ্ত মণিপুরী সাহিত্যিকদের তালিকা

সাহিত্য বিষয়ে ভারতের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান দিল্লীস্থ সাহিত্য একাডেমী ১৯৬৭ সালে মণিপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৩ সাল থেকে মণিপুরী সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের জন্য নিয়মিতভাবে সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রদান শুরু করে। নিম্নে এ পর্যন্ত এওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা দেওয়া হলো :-

	লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম	বছর	গ্রন্থের শ্রেণী
১.	পাচা মীতৈ	ইম্ফাল অমসুং মাগী ঈশিং নুংশিৎকী ফিভম [ইম্ফাল ও তার আবহাওয়া)	১৯৭৩	উপন্যাস
২.	এন কুঞ্জমোহন	ইলিশা অমগী মহাও [একটি ইলিশ মাছের স্বাদ]	১৯৭৪	ছোট গল্প
৩.	এল সমরেন্দ্র	মমাঙ লৈকাই থাম্বাল শাৎলে [সামনের পাড়ায় পদ্ম ফুটেছে)	১৯৭৬	কবিতা
৪.	এ মীনকেতন	অশৈবগী নিতাই পোদ [কবির সমাপনী গান]	১৯৭৭	কবিতা
৫.	জি সি তোংব্রা	ঙাবোং খাউ [কাপড়ের ঝুলি]	১৯৭৮	নাটক
৬.	এম কে বিনোদিনী	বড় সাহেব ওংবী সানাতোম্বী [বড় সাহেবের স্ত্রী সানাতোম্বী]	১৯৭৯	উপন্যাস
৭.	ই রজনীকান্ত	কালেনথাগী লৈবাকলৈ [জ্যৈষ্ঠের রজনীগন্ধা]	১৯৮১	গল্প
৮.	ই দীনমনি	পিষ্টল অমা কুন্দাইলৈ অমা [একটি পিষ্টল একটি কুন্দাইলৈ]	১৯৮২	গল্প
৯.	এন ইবোবী	কর্ণগী মমা অমসুং মাগী অরোয়বা য়াহিপ [কর্ণের মা এবং তার অন্তিম শয্যা]	১৯৮৩	নাটক
১০.	এল বীরমনি	চেক্লা পাইখরগদা [পাখি যখন উড়ে গেল]	১৯৮৪	গল্প
১১.	হিজম গুনো	বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড [বীর টিকেন্দ্রজিৎ রোড]	১৯৮৫	নাটক
১২.	কে এইচ প্রকাশ	মংগী ঈশৈ [শ্মশানের গান]	১৯৮৬	গল্প

১৩.	ই নীলকান্ত	তীর্থ যাত্রা [তীর্থ যাত্রা]	১৯৮৭	কবিতা
১৪.	ই সোনামনি	মমাঙ থোঙ লোল্লবদি মনিঙ থোঙদা লাকউমা [সামনের দরজা বন্ধ হলে পিছনের দিয়ে এসো]	১৯৮৮	গল্প
১৫.	নীলবরী শাস্ত্রী	তৎখ্রবা পুন্সি লৈপুন [ছিঁড়ে গেছে যে জীবনের সুতো]	১৯৮৯	গল্প
১৬.	এন বীরেন	মপান নাইদ্রবসিদা [কূল নাই কিনার নাই]	১৯৯০	কবিতা
১৭.	ওয়াই ইবোমচা	নুমিৎতি অসুম থেংজিল্লক্লি [দিন তো এমনি গড়িয়ে যায়]	১৯৯১	গল্প
১৮.	এ চিত্রেশ্বর	থরো অশংবী [নীল শাপলা]	১৯৯২	উপন্যাস
১৯.	শ্রী বীরেন	পুন্সিগী মরুদ্যান [জীবনের মরুদ্যান]	১৯৯৩	উপন্যাস
২০.	বাজকুমার মনি	ময়াই কাববা মশান	১৯৯৪	গল্প
২১.	অরাম্বম সমরেন্দ্র	লৈপাকলৈ [লৈপাকলৈ]	১৯৯৫	নাটক
২২.	আর. কে মধুবীর	পরলোইগী মৈরীলকতা [প্রলয়ের বহ্নি শিখা]	১৯৯৬	কবিতা
২৩.	থাংজম ইবোপিশক সিং	[ভূত অমসুং মাইখুম] [ভূত ও মুখোশ]	১৯৯৭	কবিতা
২৪.	কৈশাম প্রিয়কুমার	[নোঙদি তারকখিদরে] [বৃষ্টি পড়েনি]	১৯৯৮	ছোটগল্প
২৫.	সগোলশেম লনচেন্না মীতৈ	[হী নঙবু হোন্‌দেদা] [নাও তোমাকে বাহিনা]	১৯৯৯	কবিতা
২৬.	লাইতোনজম্ প্রেমচান্দ সিং	[ইমাগী ফনেক মচেৎ] [মায়ের টুকরো ফনেক]	২০০০	ছোটগল্প
২৭.	নীঙোম্বম সুনিতা	[খোংজী মখোল] [নুপুরের ধ্বনি]	২০০১	ছোটগল্প
২৮.	রাজকুমার ভূবন্না	[মৈ মমগেরা বুধী মমগেরা] [আলো না বুদ্ধি নিস্প্রভ করবে?]	২০০২	কবিতা
২৯.	সুধীর নাওরোইবম্	[লৈই খরা পুন্সী খরা] [কিছু রেখা কিছু জীবন]	২০০৩	ছোটগল্প

২. অনুবাদ সাহিত্যের জন্যে ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড প্রাপ্ত মণিপুরী লেখকদের তালিকা

১. কুমারী টি থোইবী দেবী - ১৯৮৯ ইং
২. এ শ্যামসুন্দর সিংহ -১৯৯০ ইং
৩. সি এইচ কালাচান্দ শাস্ত্রী - ১৯৯১ ইং
৪. হিজম গুনো সিংহ - ১৯৯২ ইং
৫. এল রঘুমনি শর্মা - ১৯৯৩ ইং

৩. মণিপুরী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে 'পদ্মশ্রী' উপাধি প্রাপ্তদের তালিকা

১. আতোম্বাপু শর্মা ২. সি এইচ কালাচান্দ শাস্ত্রী ৩. জিসি তোংব্রা ৪. এ মীনকেতন ৫. এম কে বিনোদিনী ৬. এন খেলচন্দ্র ৭. জি সুরচান্দ শর্মা ৮. এম কীর্ত্তি সিংহ ৯. তরুণ কুমার থিয়াম ১০. রতন থিয়াম ১১. টি এইচ হরিদাস সিংহ ১২. গুরু টি অমুদোন ১৩. ধর্মচন্দ পটনী ১৪. টি এইচ হরিদাস ১৫. আর. কে সিংহজিৎ ১৬. আর. কে ঝলজিৎ ১৭. ই. নিলকান্ত ১৮. নবকিশোর।

৪. 'সোনামণি মেমোরিয়াল এওয়ার্ড' প্রাপ্তদের তালিকা

বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলাদেশের মণিপুরীদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজ সেবা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই এওয়ার্ড দিয়ে থাকেন। মূলতঃ সোনামণি মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর আর্থিক সহযোগিতায় এই এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নিম্নে এ পর্যন্ত এওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা দেওয়া হলো ঃ-

	নাম	বিষয়	সাল
১.	কে, সুখমণি	নট সংকীর্তন	১৯৮৪
২.	টি. কুঞ্জেশ্বর (মরণোত্তর)	সমাজসেবা	১৯৮৮
৩.	এল ব্রজধন	নৃত্য	১৯৮৯
৪.	শেনজম কামেশ্বর সিংহ	সঙ্গীত	১৯৯২
৫.	এ. কে শেরাম	সাহিত্য	১৯৯৪



গুরু মৈষ্ণাম অমুবী সিং



গুরু অতোম্বা সিং



পেনা বাদক-থোয়বা সিংহ



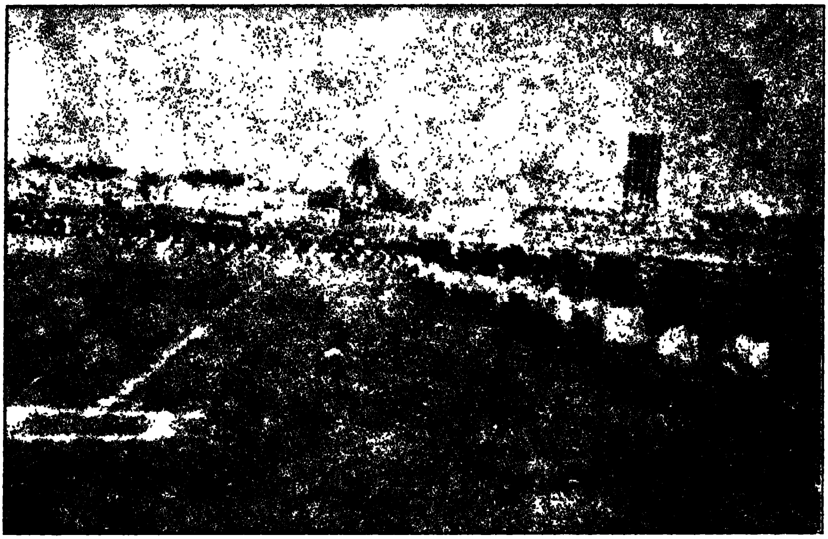
পেনা বাদক
ছবি : ই-পাও.নেট



রতন থিয়াম এর কোরাস রেপার্টরির কুশীলবদের রণ নৃত্য।



রাসে ব্যবহৃত "মন্দিরা"



মহান বিজয় দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে মণিপুরি সাংস্কৃতিক পরিষদ পরিবেশিত খম্বা থোয়বী জগোই।



থাং তা জগোই (তলোয়ার ও বর্শা নৃত্য)



ঢোল নৃত্য



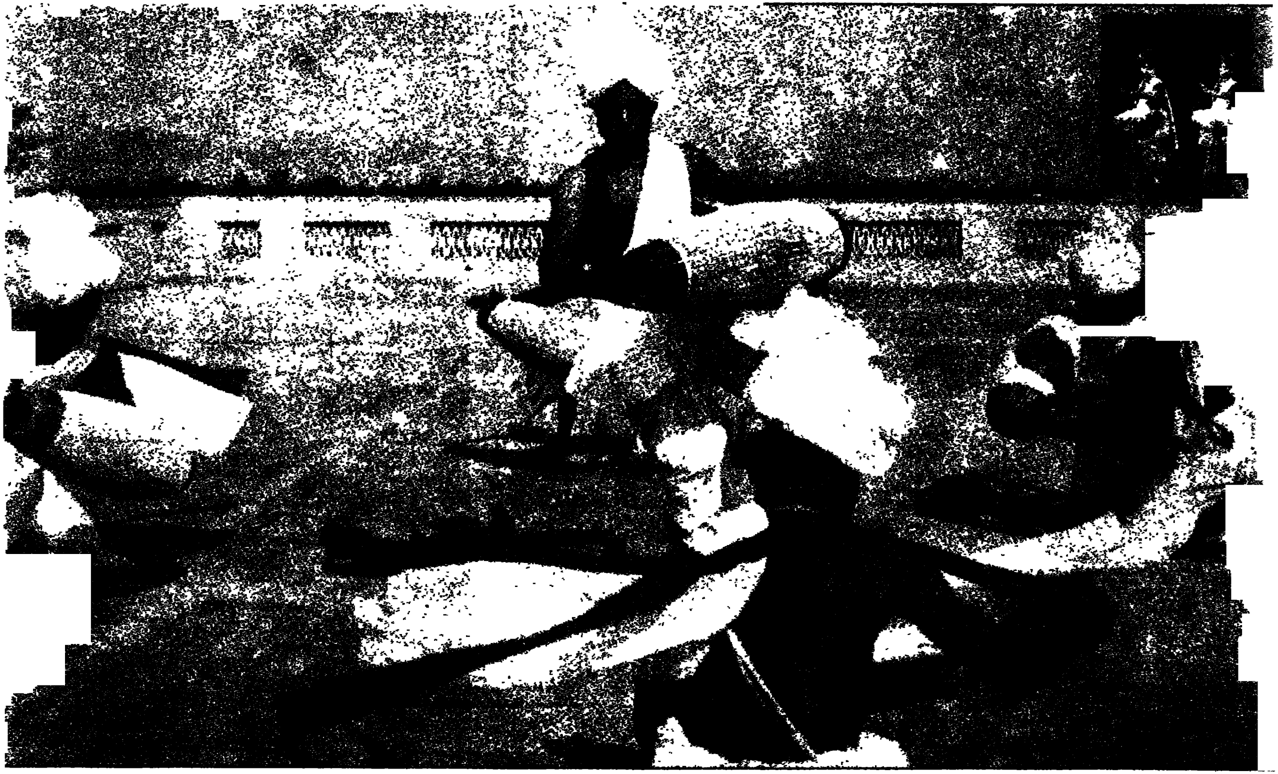
পুং (মৃদঙ্গ)



ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসব '৯৬-এ 'মণিপুরি সাংস্কৃতিক পরিষদ' পবিবেশিত 'বীর টিকেন্দ্রজিৎ' নাটক এর একটি বিশেষ দৃশ্য।



সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব '৯৬-এ প্রকাশিত স্যুভেনির এ মণিপুরি সাংস্কৃতিক পরিষদ পরিবেশিত 'বীর টিকেন্দজিৎ' নাটকের দৃশ্য। এ নাট্যোৎসবে 'বীর টিকেন্দজিৎ' বিশেষ পুরস্কার পান।



পুং চলম (মৃদঙ্গ নৃত্য)



"পদ্মশ্রী" উপাধী রতন থিয়ামকে ভূষিত করছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামস্বামী ভেঙ্কট রামন



খম্বা-থোইবী নৃত্য

ছবি : ই-পাও.নেট



খোংজম ঈশৈ



বাসক ঈশৈ



নিপা পালা

ছবি : ই-পাও.নেট



খুবাক ঈশৈ



বাস নৃত্য



কৃষ্ণ নৃত্য



হৈজিংপোৎ ওকপা